ড. রাগিব সারজানি

ইসলামই দিয়েছে সবার অধিকার

আব্দুল্লাহ কামাল
অনূদিত

দিকনির্দেশনা ও সম্পাদনা
মুফতি আমানুল হক দা. বা.
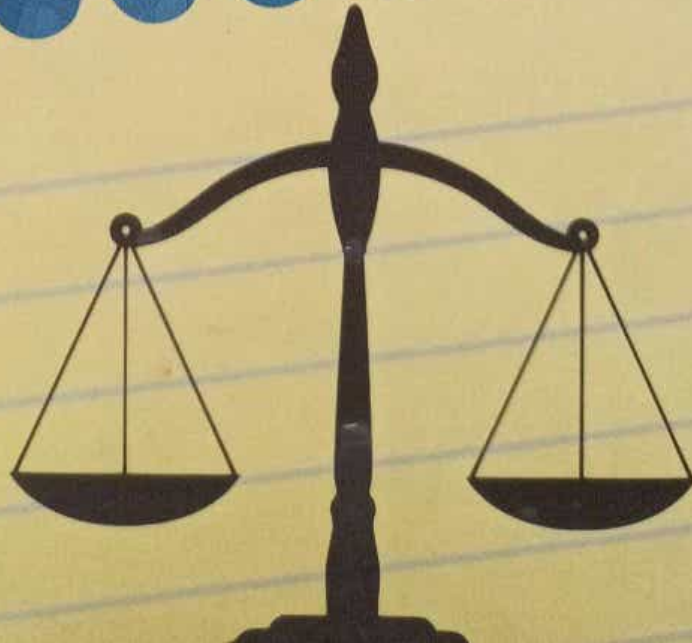
লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানি
Dr. Rageb Sarjani
জন্ম: ১৯৬৪ঈ.
আল মুহাল্লা কুবরা, মিশর।
ড. রাগেব সারজানী মিশরের বিশিষ্ট ইসলামপ্রচারক, ইতিহাসবিদ ও একজন আধুনিক আরবলেখক। পেশায় মূলত তিনি একজন ডাক্তার। তবে ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি ইসলামী ইতিহাসের গভীর গবেষণা বর্তমান পৃথিবীতে তাকে একজন বিশিষ্ট ইসলামী ইতিহাসবিদ হিসেবে পরিচিত করেছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর পবিত্র কুরআনুল করীম হিফজ করেন। ইসলামের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা-তার চোখের তারায় যে আগামীর স্বপ্ন আঁকে-সেই স্বপ্ন বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতেই তার লেখালেখি। এই স্বপ্ন ছবি হয়ে উড়ে বেড়ায় তার রচনার ছত্রে ছত্রে।

শিক্ষা

তিনি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদ থেকে ইউরোসার্জারি বিষয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র কুরআনুল করীম হিফজ করেন।

কর্মক্ষেত্র

অধ্যাপক : মেডিসিন অনুষদ, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়,সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম উলামা পরিষদ,সদস্য : মানবাধিকার শরীয়া বোর্ড, মিশর,সদস্য : আমেরিকান ট্রাস্ট সোসাইটি ,প্রধান : ইতিহাস বিভাগ, ইদারাতুল মারকাযিল হাজারা, মিশর

রচনাবলি

ইতিহাস ও ইসলামী গবেষণা বিষয়ে এ পর্যন্ত তার ৫৬টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য— কিসসাতুত তাতার (তাতারীদের ইতিহাস),কিসসাতু উন্দুলুস (স্পেনের ইতিহাস),কিসসাতু তিউনুস (তিউনেসিয়ার ইতিহাস) আর রহমা ফি হায়াতির রসূল মা'আন নাবনী খায়রা উন্মাতিন প্রভৃতি।

ড. রাগেব সারজানি

ইসলামই দিয়েছে সবার অধিকার

দিকনির্দেশনা ও সম্পাদনা

মুফতি আমানুল হক দা.বা.

খতীব: ভিক্টোরিয়া পার্ক জামে মসজিদ

সদরঘাট, ঢাকা-১১০০

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ কামাল

উৎসর্জন

মরহুম বাবা ডা. সালাহউদ্দীন রহ.। যার হাতে বইটি তুলে দিতে পারলে খুব ভালো লাগতো। ০৪-০৭-১০ ইং তারিখে আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগের এই দিনে যিনি তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন এবং আমাদের ব্যাপারে করে যাওয়া তার সমস্ত নেক আশাগুলো পূরণ করুন। আমীন।।

অর্পণ

মমতাময়ী মায়ের বরকতময় হাতে। যার আদর-শাসন আর জায়নামাজের চোখের পানি আমাদের এ পর্যন্ত আসার অন্যতম পাথেয়। আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন। আমীন।।

সূচিপত্র

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! বহু অপেক্ষা ও প্রতীক্ষার পর ড. রাগেব সারজানির সাড়া জাগানো কিতাব 'আল আখলাকু ওয়াল কায়্যিম ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়্যাহ' এর বাংলা অনুবাদ 'একমাত্র ইসলামই দিয়েছে সবার অধিকার' এখন পাঠকের হাতে পৌছার দ্বারপ্রান্তে। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছি না। তাই আবারও বলছি আলহামদুলিল্লাহ!!!

ড. রাগেব সারজানি। পেশায় একজন ডাক্তার হলেও তার পরিচিতি এখন ইতিহাসবিদ, গবেষক ও একজন খ্যাতিমান আরব লেখক হিসেবে। পাঠক সমাজে তার নতুন করে পরিচয় দেয়া– অযথা কথা বাড়ানোর নামান্তর। তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসেন ইসলামকে । গবেষণা করেন ইসলামী ইতিহাস নিয়ে। তিনি স্বপ্ন দেখেন মুসলিম উম্মাহর উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে । পছন্দ করেন ইসলামের পয়গাম বিশ্বের দিকে দিবে ছড়িয়ে দিতে। সর্বোপরি মহান আল্লাহর দ্বীন, প্রিয় নবীর দাওয়াত, ইসলামের অনন্য সৌন্দর্য আর শরীয়তের বিধি-বিধান প্রোথিত হোক প্রতিটি মানব হৃদয়ে, মন ও মস্তিষ্কে– এটাই তার একান্ত কামনা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতেও তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্তাকারে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন ইসলামের আসল সাম্য-সৌন্দর্য-নীতি-আদর্শ। ইসলামের প্রকৃত রূপ জানতে হলে একজন পাঠককে অবশ্যই বইটি পড়তে হবে। আর না হয় ইসলামের আসল সৌন্দর্যই বুঝতে পারবে না। সীমিত কিছু বিধি-বিধানকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করতে থাকবে।

অকপটে একটি কথা বলে রাখি, আমি নিয়মিত কোনো লেখক নই, সাহিত্যিকও নই– এটাই আমার প্রথম অনুবাদকর্ম। চেষ্টা করেছি, মূল কিতাবের শব্দ-মর্ম ঠিক রেখে একদম সহজ-সরল শব্দে-বাক্যে একটি সাবলীল অনুবাদ উপহার দেয়ার জন্য– যাতে ছোট-বড় সবাই সহজে বুঝতে পারে। কতটুকু হয়েছে সেটা বিজ্ঞ পাঠকই বলতে পারবেন। তবে যতটুকু সুন্দর-সঠিক, সবটুকুই আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানী। আর যতটুকু অসুন্দর ও ভুল-ত্রুটিসম্পন্ন, সম্পূর্ণটাই আমার অযোগ্যতা আর অসচেতনতার ফল।

আমি বিশ্বাস করি, অবশ্যই আমার লেখায় ভুল আছে। তবে আশা রাখি, বিজ্ঞ পাঠক তা শুধরে দিয়ে অনলাইনে বা অফলাইনে আমাকে একটু অবহিত করে আমার প্রতি এহসান করবেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমি জাযাকাল্লাহ জানাই তাদেরকে, যারা আমাকে ক্ষণে-ক্ষণে তাগাদা আর উৎসাহ দিয়ে দ্রুত অনুবাদ শেষ করতে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে জীবনসঙ্গীনী বিনতে আমান ও ছোট ভাই সাইফুল্লাহর কথা না বললে বড় অকৃজ্ঞতার পরিচয় হবে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন।

বিনীত

আব্দুল্লাহ কামাল
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
০৪-০৭-২০ ইং
abdullahkamal24@gmail.com

তাবলীগের বিশিষ্ট মুরুব্বী, প্রখ্যাত দায়ী, ভিক্টোরিয়া পার্ক জামে মসজিদের সম্মানিত খতীব হযরত মাওলানা মুফতি আমানুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের-

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। লাখো-কোটি দরুদ ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যাকে তিনি সমস্ত নবীগনের সরদার বানিয়েছেন।

দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ তথা কাফের-মুশরিক, সাদা-কালো, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই চায়- শান্তি-সফলতা-মুক্তি। মূলত এগুলো হাসিল করার জন্যই মানুষের দিনরাত কতশত মেহনত আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা।

যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রকৃত সফল কে? তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর আসবে- যে ধনী সে সফল। যে ক্ষমতাবান সে সফল। যে সম্মানিত সে সফল। ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন- "যে ব্যক্তি আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো, সেই প্রকৃতপক্ষে সফলতা লাভ করলো।"[১]

কাফেরদের কথা তো বাদই দিলাম, অনেক মুসলমানের ধারণা এমন- আখেরাতে সফলতার জন্য তো দ্বীন মানতে হবে, কিন্তু দুনিয়ার শান্তি-সফলতা দ্বীন দিয়ে হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন- পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ, সম্পদ, সম্মান, সৌন্দর্য, বংশ, ক্ষমতা ও শক্তি ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া দুনিয়াতে সফলতা অসম্ভব। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরামের সফল জিন্দেগী এ কথার বাস্তব প্রমাণ- দুনিয়ার সফলতা

---

[1] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৫

অর্থ, সম্পদ, সম্মান, সৌন্দর্য, বংশ, ক্ষমতা ও শক্তি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না; বরং দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় জগতের শান্তি-সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ হলো– পরিপূর্ণভাবে দ্বীনে ইসলামের উপর চলা। কেননা, "আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা ধর্মই হলো ইসলাম।"[২] "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্যকোনো দ্বীন পালন করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না; বরং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৩]

দ্বীন আসলে কী জিনিস এটাই আমাদের ভালোভাবে জানা নেই। তাই সবাই দ্বীনটাকে যার যার মত বুঝতে চেষ্টা করি। কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আর মনে করি এটাই দ্বীন। কেউ রবিউল আউয়াল এলে মিলাদ পড়ে মিষ্টি খাই, আর মনে করি এটাই দ্বীন। কেউ বছর বছর হজ করি আর মনে করি এটাই দ্বীন। আবার কেউ মাথায় টুপি-পাগড়ী আর গায়ে লম্বা জুব্বা লাগিয়ে মনে করি আমিই বড় দ্বীনদার। আসলে আমরা দ্বীনের কিছু বিধি-বিধান আর আমলের মধ্যেই দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি।

অথচ প্রকৃতপক্ষে দ্বীন সীমিত কিছু আমলের নাম নয়। ইসলাম কোনো সীমাবদ্ধ ধর্ম নয়। গুটিকয়েক আমল আর রেওয়াজ-রুসমের নাম দ্বীনে ইসলাম নয়। দ্বীন হলো– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভ থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ২৩ বছরের গোটা জিন্দেগীর নাম। ইস্তিঞ্জায় গিয়ে বেজোড় সংখ্যক ঢিলা নেয়াও দ্বীনের অন্তরর্ভূক্ত। পশ্চিমদিকে পা দিয়ে না বসাও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। আবার ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করাও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। মোটকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি অবস্থাই দ্বীনের অংশ। সুতরাং দ্বীন একটি ব্যাপক বিষয়। ইস্তিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করা থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সকল কিছুই দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হবে, যদি তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীর সাথে মিল থাকে।

---

[২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯
[৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি অবস্থার বিধান দ্বীনে ইসলামে রয়েছে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা, শ্রমনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসায়নীতি, অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক, সমাজ সংস্কার, দুস্থ মানবতার সেবা, শিশুর প্রতি ভালোবাসা, এতিমের দেখাশোনা, সম্পদ বন্টন, উত্তরাধিকারী আইন, যাকাত ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আদমশুমারী ব্যবস্থা, দাওয়াত ও তাবলীগ ইত্যাদি– সবকিছুই রয়েছে ইসলাম ধর্মে। এজন্যই তো বলা হয়- ISLAM IS THE COMPLETE CODE OF LIFE অর্থাৎ ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং কোনো সীমাবদ্ধ ধর্মের নাম ইসলাম নয় বা ইসলামে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৪] হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন- "যদি আমার উটের রশিটিও হারিয়ে যায়, তবুও আমি তা পাওয়ার ব্যবস্থা এই দ্বীনের মধ্যেই পাই।"[৫]

একজন মুসলমানকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানতে হবে। পরিপূর্ণ মুমিন-মুসলমান হতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কর্মে ইসলামকে ফলো করতে হবে। তবেই সে হবে পরিপূর্ণ মুসলমান ও পূর্ণাঙ্গ মুমিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "হে ইমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখেল হয়ে যাও।"[৬] অর্থাৎ ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান তোমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে যাও। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন- "পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।"[৭] অর্থাৎ মৃত্যুর আগেই পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে

---

[৪] সুরা মায়েদাহ, আয়াত: ৩
[৫] তাফসীরে রুহুল মাআনী: ১৪/৯৮
[৬] সুরা বাকারাহ, আয়াত: ২০৮
[৭] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২

যাও। আর না হয় তুমি সফল হতে পারবে না। কবরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমান আনার পর যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো- প্রত্যেকের হক আদায় করা। হক আদায় করার অর্থ হলো- যে যেটা প্রাপ্য তাকে সেটা আদায় করা। অথবা এভাবেও বলা যায়- যার সাথে যেমন ব্যবহার করা দরকার, তার সাথে তেমন করা মানেই হক আদায় করা।

হক সাধারণত দুই প্রকার- (১) হুকুকুল্লাহ– আল্লাহ তাআলার হক। (২) হুকুকুল ইবাদ– বান্দার হক। এ দুই প্রকার হক আদায় করার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া সম্ভব। এজন্য বলা যায়- হক আদায় করার নামই হলো ইসলাম।

আমরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ আরও যত ইবাদাত করি, এগুলো হলো হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার হক। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত মুআয রাযিআল্লাহু আনহুকে বললেন, হে মুআয! বলো তো, বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার কী হক আর আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার কী হক? উত্তরে হযরত মুআয রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুল এ সম্পর্কে ভালো জানেন। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার হক হলো- বান্দারা তার ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ তাআলার উপর বান্দাদের হক হলো- তারা যখন আল্লাহ তাআলার হক পুরা করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।"[৮]

আমরা সবাই জানি; বরং এটাই চিরসত্য কথা– পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর চললে দুনিয়াতেও শান্তি, সফলতা ও কল্যাণ লাভ হয়; আর আখেরাতেও শান্তি, মুক্তি

---

[৮] সুনানে ইবনে মাজাহ। হাদীস নং-৩৪৮৭

ও নাজাতের ফায়সালা হয়। কিন্তু আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, হজ করি, যাকাত দেই, এ ছাড়াও আরও কত ইবাদাত করি, তবুও দেখা যায় আমাদের শান্তি নেই, সফলতা নেই, জীবনের কোনো উন্নতি নেই। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন– সবখানেই শুধু অশান্তি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা আর নানান সমস্যায় ভরপুর।

এসবের মূল কারণ হলো- আমরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু আল্লাহ তাআলার হক আদায় করছি আর মনে করছি আমি তো পরিপূর্ণ দ্বীনদার। কারণ আমি পূর্ণ দ্বীন মেনে চলি। অথচ বাস্তবতা হলো- আমার দ্বারা দ্বীনের শুধু একটা অংশ তথা হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার হক আদায় হচ্ছে কিন্তু দ্বীনের আরেকটি বিরাট অংশ তথা হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি জানিই না- হুকুকুল ইবাদ কী জিনিস এবং এটা দ্বীনের কত বড় অংশ! কোনো কোনো বুযুর্গ তো বলেন- দ্বীনের এক চতুর্থাংশ হলো হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার হক। আর বাকি তিন চতুর্থাংশই হলো হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক। কারণ ইসলামী আইনের বিখ্যাত কিতার হেদায়াহ মোট চার খণ্ডে লিখিত। এরমধ্যে শুধু এক খণ্ডে হুকুকুল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনা। আর বাকি তিন খণ্ডই হুকুকুল ইবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায়- ইসলামে বান্দার হক আদায় করা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যদি দুনিয়াতে কেউ কারও হক নষ্ট করে, তাহলে এটা কিছুতেই মাফ হবে না; তার এই হক আদায় করতেই হবে। দুনিয়াতে না করলে আখেরাতে হলেও তার এই হক আদায় করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যদি কেউ দুনিয়াতে কারও হক নষ্ট করে, আর দুনিয়াতে তা আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন এই হক আদায় করতে হবে। এমনকি দুনিয়াতে যদি কোনো শিং বিশিষ্ট্য প্রাণী শিং ছাড়া প্রাণীর উপর অন্যায়ভাবে

আক্রমণ করে তার হক নষ্ট করে থাকে, তাহলে আখেরাতে এটাও তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়া হবে।"[৯]

যার দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হবে, সে তো কিছুতেই পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন- আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি মুমিন না! আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি মুমিন না! আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি মুমিন না! সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন- যার প্রতিবেশি তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ না, সেই ব্যক্তি।"[১০]

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়- বান্দার হক নষ্ট করে কেউ পরিপূর্ণ দ্বীনদার কিছুতেই হতে পারে না। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি, সফলতা, কামিয়াবি, নাজাত ও মুক্তি পেতে হলে পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলতে হবে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমরা মূলত পরিপূর্ণ দ্বীন না মানার কারণেই পরিপূর্ণ শান্তি-সফলতা লাভ করতে পারি না। আর আখেরাতেও নাজাত ও মুক্তির আশা করা যায় না। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশি তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।"[১১]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বান্দার হক সম্পর্কে লিখিত। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বান্দার সমস্ত হকের ব্যাপারে আলোচনা করা হয় নাই, তবে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো হক সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি সবার জন্যই বেশ উপকারী। একবার হলেও সবার পড়া উচিৎ। তাহলে বান্দার হক সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যাবে। আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেনো এই গ্রন্থটিকে হেদায়াতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন

---

[৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৮০৭
[১০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬০১৬
[১১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৬

এবং যারা এর পেছনে মেহনত করেছে, তাদের মেহনতকে কবুল করেন। আমীন।

02/07/2020

মুফতি আমানুল হক দাঃ বাঃ

খতীবঃ ভিক্টোরিয়া পার্ক জামে মসজিদ

মুহতামীমঃ মাদরাসা নুরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, সদরঘাট, ঢাকা

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকঃ আল জামিআতুল ইসলামিয়া দারুত তালীম ওয়াত তারবিয়াহ, শরীফ হাউজিং (শরীফ নগর) কোনাখোলা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গুরুত্বঃ

ইসলামী সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ হলো একটি আধ্যাত্মিক বা অভ্যন্তরীণ বিষয়। সাথে সাথে এটা এমন একটি মৌলিক বিষয়, যার উপর ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। শতশত বছর জুড়ে ইসলামী সভ্যতা টিকে থাকার মূল রহস্যও এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যেদিন তা হারিয়ে যাবে; সেদিন মানুষের আধ্যাত্মিক সক্ষমতা ও বিবেকবোধ লোপ পাবে। ফলে অবস্থা এমন হবে যে, মানুষের অন্তর থেকে মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি চলে যাবে। অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়বে। আর সে হবে কর্তব্যবিমুখ। এভাবে এক সময় সে তার অস্তিত্বকেই চিনবে না, নিজেকে চেনা তো দূরের কথা। ধীরে ধীরে সে এমন বস্তুবাদের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবে, যার থেকে মুক্তি লাভের আর কোনো পথ পাবে না।

পূর্ববর্তী সভ্যতায় নৈতিকতাঃ

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সভ্যতা এবং আধুনিক যুগের তেমন কোনো কৃতিত্ব নেই। নেই কোনো বিশেষ ভূমিকাও। একথা স্বীকার করেছেন খোদ পশ্চিমা বিশ্বের পণ্ডিতব্যক্তিবর্গ এবং গবেষকগণ। এক ইংরেজ লেখক চমৎকার বলেছেন– "আধুনিক সভ্যতায় বাহ্যিক শক্তি ও আভ্যন্তরীণ নৈতিকতার মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয় না। ফলে নৈতিকতার অবস্থান জ্ঞান থেকে অনেক দূরে। পদার্থ বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদেরকে তীব্র শক্তি উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমরা তা শিশুসুলভ আকল আর পশুসুলভ বিবেক দিয়ে কাজে লাগাই.... মানুষের নৈতিক অবনতি বলতে বুঝায়– তার অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে না-জানা এবং মূল্যবোধের জগতকে অস্বীকার করে বসা। অথচ এই মূল্যবোধেই রয়েছে– সততা, সৌন্দর্য, আদর্শ আর প্রকৃত কল্যাণকামিতা।"[১২]

আরেক পশ্চিমা দার্শনিক 'অ্যালেক্সিস কার্লাইল' বলেন– "আধুনিক শহরে আমরা এমন লোক খুব কমই দেখতে পাই, যারা নৈতিকতার মত মূল্যবান

---

[১২] মুকাদ্দামাতুল উলুমি ওয়াল মানাহিজ: ৪/৭৭০

বিষয়ের অনুসরণ করে। অথচ একটি সভ্যতার মূল ভিত্তি হিসেবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সৌন্দর্য সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে গেছে।"[১৩]

প্রকৃত বাস্তবতা হলো– নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিষয়টি শুধুমাত্র মুসলিম সভ্যতায়ই পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়; বরং এ সভ্যতার মূল ভিত্তিই হলো এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার মাঝে অনৈতিকতা, অরাজকতা আর বর্বরতার সয়লাবের পর যখন তারা পরস্পর ছিন্নবিচ্ছিন্ন, শতধা বিভক্ত; ঠিক তখনই ইসলাম ধর্মের নবীকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে উত্তম আদর্শ ও নৈতিকতা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

ইসলামের পূর্বে এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যুগযুগ ধরে বিশ্বমানবতায় তেমন মানবিক কোনো ফসল বয়ে আনতে পারেনি; বরং আল্লাহ প্রদত্ত ওহী আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথই একে পূর্ণতা দান করেছে। সুতরাং দীর্ঘ প্রায় পনেরো শতাব্দী যাবত ইসলামী শরিয়তই হচ্ছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের একমাত্র মশালধারী।

---

[১৩] আল ইনসানু যালিকাল মাযহুল:১৫৩

ইসলামী সভ্যতায় মানবাধীকার

ভূমিকাঃ

পশ্চিমা দার্শনিক 'ফ্রেডরিক নিতশে' বলেন– "দুর্বল-অসহায় মানুষগুলো একসময় অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, এটাই হলো আমাদের মানবতার প্রতি ভালোবাসার মৌলিক কারণ।"[১৪]

কিন্তু ইসলামী শরিয়ত ও দর্শন কখনও নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ভাষা-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম কখনও পিছিয়ে থাকেনি। পিছু হটেনি পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয় থেকেও। বরং ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমেই এই সমস্ত অধিকারগুলো রক্ষা করা হয়েছে এবং এর বাস্তবতা নিশ্চিত করা হয়েছে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করবে, তাদের জন্য রাখা হয়েছে শাস্তির বিধান।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাঃ

ইসলাম মানবতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বাণী থেকেই একথা সুস্পষ্ট। তিনি বলেন– "আমি মানবজাতিকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে জলস্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি। আর আমার সকল সৃষ্টির মাঝে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১৫]

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ইসলামে মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ বৈশিষ্ট ও বিশেষত্ব রাখে। বিশেষ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সকল অধিকারকেই সন্নিবেশিত করে। মুসলিম-অমুসলিম-ভাষা-বর্ণ-জাতি–নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার ইসলাম দিয়েছে । এই অধিকার কেউ বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে এই অধিকার।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণে এ বিষয়টিকে আরও মজবুত করেছেন । তার সেই ভাষণটি ছিল মানবাধিকারের পক্ষে এক

[১৪] রকাইযুল ঈমান বাইনাল আকলি ওয়অল ক্বালব:৩১৮
[১৫] সুরা বানী ইসরাঈল, আয়াত নং-৭০

বলিষ্ঠ উচ্চারণ। সেদিন তিনি বলেছিলেন– "তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে তোমাদের এই দিন যেমন পবিত্র; কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জান-মাল তেমন পবিত্র।"[১৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ভাষণের মাঝে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মানসহ সমস্ত অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

তিনি মানুষের সর্বোচ্চ অধিকার- জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করতে গিয়ে বলেন– "সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা.....এবং নিজের জীবন নিজে শেষ করা।"[১৭]

উক্ত হাদীসে জীবন শব্দ দ্বারা বিনা অপরাধে শেষ করা প্রত্যেকটি জীবনকেই বুঝানো হয়েছে।

তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজীবন রক্ষার প্রতি একটু বেশিই গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করে আত্মরক্ষাকে ওয়াজিব করেছেন। তিনি বলেন– "যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামী। চিরকাল সে জাহান্নামে পাহাড় থেকে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার হাতে বিষ দেয়া থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামে বিষ পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, তার হাতে লোহা দেয়া থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামে লোহা দিয়ে পেটে আঘাত করতে থাকবে।"[১৮]

এছাড়াও ইসলাম ঐ সমস্ত কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে, যা মানবজীবনে কোনো রকম ক্ষতি সাধন করে। চাই সে কাজটি ভয় দেখানোর জন্য হোক বা অপদস্ত করার জন্য হোক অথবা অনর্থক শাস্তি দেয়ার জন্য হোক। হযরত হিশাম ইবনে হাকেম রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[১৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -১৬৫৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৭৯

[১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৫১০ সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং- -৪০০৯ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৮৮৪

[১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৪৪২সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০৯

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি– "আল্লাহ তাআলা ঐসকল ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে (অনর্থক) শাস্তি দেয়।"[১৯]

সকল মানুষ সমানঃ

ইসলাম মানুষকে ব্যাপকভাবে সম্মানিত করেছে। মানুষের জান, মাল ও সম্মানের উপর আঘাত করাকে হারাম ঘোষণা করেছে । জীবনের সর্বোচ্চ অধিকার বাস্তবায়ন করেছে। এরপর সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামে ব্যক্তি-গোষ্ঠী, জাত-বংশ, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব বণিক-শ্রমিক সবাই সমান। এদের মাঝে কোনো উঁচুনিচু শ্রেণিভেদ নেই। শরিয়তের হুকুম-আহকামে আরব-অনারব, সাদা-কালো ও রাজা-প্রজার মাঝে কোনো তফাত নেই। বরং মানুষ হিসেবে আল্লাহর তাআলার কাছে সবাই সমান। তবে একে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার মাপকাঠি হলো শুধুমাত্র– 'তাকওয়া বা খোদাভীতি'। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "হে মানব সকল! তোমাদের রব একজন। তোমাদের পিতা একজন। তোমরা প্রত্যেকেই আদমের সন্তান। আর আদম আলাইহিসসালাম মাটির তৈরি। তোমাদের মাঝে যে বেশি খোদাভীরু, সেই তোমাদের মাঝে বেশি সম্মানিত। কোনো অনারবীর উপর আরবীর শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো– 'তাকওয়া'।"[২০]

যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাস্তব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে সেখানেও আমরা সমান অধিকার বাস্তবায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। হযরত আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "একবার হযরত আবু যর রাজিয়াল্লাহু আনহু হযরত বেলাল রাজিয়াল্লাহু আনহু কে তার মায়ের নাম নিয়ে তিরস্কার করে বললেন- 'হে কালোর বেটা'। একথা শুনে হযরত বেলাল রাজিয়াল্লাহু আনহু রাগ হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিচার দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আবু যর রাজিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। তিনি এটা বুঝতে পারেননি যে, তার নামে ইতিপূর্বেই বিচার দেয়া হয়েছে। তাকে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা ঘুরিয়ে

---

[১৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -২৬১৩ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৩০৪৫ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৩৬৬

[২০] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- -২৩৫৩৬ আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-১৪৪৪৪

নিলেন। আবু যর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার নামে আপনি কিছু শুনেছেন, তাই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি বেলালকে তার মায়ের নাম নিয়ে তিরস্কার করেছো? শুনে রেখো, ঐ সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদের উপর কিতাব নাযিল করেছেন– প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হয় তার আমলের মাধ্যমে। আর তোমরা হলে সা'[২১] এর কিনারার মত।"[২২]

ইসলামে ন্যায়বিচারঃ

মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি অধিকার হলো– 'ন্যায়বিচার'। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা যায় এই ঘটনাটি– একবার এক মাখযুমী মহিলা চুরি করেছিলো। হযরত উসামা বিন যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন তার হাত না-কাটার সুপারিশ নিয়ে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন– "ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের জান। যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করতো, তাহলে আমি তার হাতও কেটে ফেলতাম!"[২৩]

কারও দ্বারা যেনো কেউ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, সবাই যেনো ন্যায়বিচারের পূর্ণ অধিকার বুঝে পায়; এদিকে লক্ষ্য করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে বাঁচাতে গিয়েও অন্যের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। একবার এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাওনা আদায় করতে এসে খুব খারাপ ভাষায় কথা বলতে লাগলো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন– হে আল্লাহর রাসুল! আপনি অনুমতি দিন, আমরা এই লোককে শায়েস্তা করে দেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "না, এই লোককে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।"[২৪]

---

[২১] সা' হলো এক প্রকার পাত্র। যা দ্বারা বিভিন্ন জিনিস মাপা হয়। এখানে বুঝানো হয়েছে– তোমরা প্রত্যেকেই সা' এর কিনারার মত সমান সমান। কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ নও। তবে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তোমাদের আমল ও খোদাভীতি। (লিসানুল আরব:৯/২২১)

[২২] শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৫১৩৫

[২৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৩২৮৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৮৮

[২৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২১৮৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬০১

যারা মানুষের মাঝে বিচার-শালিশ করেন, তারা যাতে ন্যায়বিচার ঠিক রাখতে পারে, এজন্য তাদের প্রতি লক্ষ্য করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "যখন বাদী-বিবাদী দু' পক্ষ তোমার সামনে আসবে, তখন তুমি এক পক্ষের কথা শুনে অপর পক্ষের কথা না শুনে কোনো ফায়সালা করো না। এটা তোমার জন্য সঠিক রায় দিতে সহায়ক হবে।"[২৫]

ইসলামে পর্যাপ্ত জীবনোপকরণের অধিকারঃ

ইসলমী শরিয়তের সাথে সম্পৃক্ত এমন একটি অধিকার রয়েছে, যে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো মানবরচিত আইনে কিছু বলা হয়নি। মানবাধিকার বিষয়ে যত চুক্তি-সনদ, দলিল-দস্তাবেজ আর আইন-কানুন রচিত হয়েছে– এ ব্যাপারে সবকিছুই একদম চুপ। সেই অধিকারটি হলো– 'মানুষের পর্যাপ্ত জীবনোপকরণের অধিকার'। অর্থাৎ ইসলমী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ নিয়ে বসবাস করবে। যাতে সে স্বচ্ছলভাবে বাঁচতে পারে, এবং তার জন্য সুষ্ঠু-স্বাভাবিক-সুন্দর জীবন যাত্রার ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়টি মানবরচিত জীবনব্যবস্থাগুলোর দেয়া নিম্নমানের জীবনব্যস্থা থেকে একটু আলাদা।[২৬]

পর্যাপ্ত জীবনোপকরণের অধিকার বাস্তবায়িত হয় কাজের মাধ্যমে। যখন কোনো ব্যক্তি কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে, তখন তার জন্য যাকাতের ব্যবস্থা করা হবে। যদি যাকাতের মাধ্যমেও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের জন্য আলাদা বাজেট ঘোষণা করা হবে। এবং তাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিকেই এভাবে বলেছেন– "যে ব্যক্তি কোনো ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলো, তার ঋণ আদায় করা এবং সন্তানদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার।"[২৭]

---

[২৫] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৩৫৮২ জামে তিমিযী, হাদীস নং- -১৩৩১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৮৮২

[২৬] মওসুআতু হুকুকিল ইনসানি ফিল ইসলাম: ৫০৫,৫০৯

[২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৫০৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অধিকারের উপর আরও গুরুত্বারোপ করে বলেন– "ঐ ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি, যে তৃপ্তি ভরে খায়, আর তার পাশের প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে; যা সে জানে।"[২৮]

পক্ষান্তরে যারা অন্যের খেয়াল রাখে, খোজ-খবর রাখে; তাদের প্রতি খুশি হয়ে তাদের প্রশংসা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে যায়, অথবা মদীনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনে খাবার-ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তারা নিজেদের কাছে থাকা সমস্ত সম্পদকে একত্রিত করে একটি কাপড়ে জমা করে। এরপর একটি পাত্র দ্বারা মেপে প্রত্যেকে সমানভাগে বণ্টন করে নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভূক্ত) আর আমিও তাদের (দলভূক্ত)।"[২৯]

নাগরিক ও পারিবারিক অধিকারঃ

ইসলাম তো স্বাভাবিকভাবে সকলের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেই; যুদ্ধক্ষেত্রেও নাগরিক ও পারিবারিক অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রেখেছে। যুদ্ধে সাধারণত সবাই প্রতিশোধ আর লড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মানবতা আর দয়ার সবক তখন কারও মাথায় থাকে না। কিন্তু ইসলাম এমন এক কঠিন মুহূর্তেও মানবতার কথা ভুলে যায় নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা শিশু, নারী আর বয়স্কদেরকে হত্যা করো না।"[৩০]

অনুরূপভাবে ইসলামে আরও কিছু নীতি-আদর্শ রয়েছে, যার মাধ্যমে এই অমানবিক পৃথিবীর বুকে মানবাধিকারের ঝাণ্ডা সমুন্নত করে এক সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়েছে। আর সামগ্রিকভাবেও ইসলাম মানবতার কল্যাণের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। কেননা, এই মানবতাই তো মূলত মুসলিম সভ্যতার প্রাণ।

---

[২৮] আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৭৫০ শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৩২৩৮ -আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং-৭৩০৭

[২৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৩৫৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫০০

[৩০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -১৭৩১ আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৪৩১৩

ইসলামী সভ্যতায় নারীর অধিকার

ভূমিকাঃ

ইসলাম নারীকে যত্ন আর তত্ত্বাবধানের বেড়ায় আবদ্ধ করেছে। তাদেরকে সম্মানের উচ্চাসন দিয়েছে এবং বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছে। আর তাদেরকে মেয়ে, স্ত্রী, বোন ও মা হিসেবে দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো– "নারী-পুরুষ সবাই একই ব্যক্তি থেকে তৈরি। সুতরাং মানবিক বিবেচনায় নারী-পুরুষ সবাই সমান।" আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। (প্রথমে) তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের দু'জন থেকে আরও অনেক অনেক নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[৩১]

এ বিষয়ে আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেখানে সমস্ত মানুষের মাঝে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান, আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে– এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা হয়েছে।

ইসলামে নারীর অবস্থানঃ

ইসলামের পূর্বে অন্যান্য ধর্মে এবং জাহিলি যমানায় নারীরা যে নিম্ন অবস্থানে ছিলো, ইসলাম এসে নারীদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে এমন এক উচ্চস্থানে এনেছে; যে পর্যন্ত কোনো যমানায়ই নারীরা পৌঁছতে পারেনি, আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা, ইসলাম চৌদ্দ শতাব্দী যাবত নারীকে মা, বোন, স্ত্রী ও মেয়ে হিসেবে ঐসব অধিকার দিয়ে আসছে, যেগুলো লাভ করার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা দীর্ঘকাল যাবত একের পর এক সংগ্রাম করে আসছে; কিন্তু আজও তাদের কপালে জুটেনি সেসব অধিকার।

অথচ ইসলাম সেই শুরু থেকেই এ কথা স্বীকার করে আসছে যে, সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের মতই। নারী হওয়ার কারণে কখনই তাদের সম্মান বিন্দুমাত্র কম হবে না। এ বিষয়ে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৩১] সুরা নিসা, আয়াত নং-১

ওয়াসাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন– "নারীরা হলো পুরুষদের বোন।"[৩২]

তিনি নিজে সর্বদা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন আর সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে জোর নির্দেশ দিয়ে বলতেন– "তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।"[৩৩]

বিদায় হজ্বে লক্ষাধিক সাহাবীর সামনেও তিনি এই নসীহতটি বারবার করেছেন।

জাহিলি যমানায় নারীর অবস্থানঃ

যদি আমরা আরও স্পষ্টভাবে জানতে চাই যে, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম কী কী নীতি অবলম্বন করেছে, তাহলে আমাদেরকে আগে জাহিলি যমানা এবং বর্তমান যুগের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে।

আমরা দেখতে পাই– জাহিলি যমানায় ছিল ঘোর-অন্ধকার। নারীরা ছিল অবহেলিত-অপদস্ত। সমাজে তাদের মূল্য বলতে কিছুই ছিলো না। আর বর্তমানেও ইসলামী সভ্যতাকে অবমূল্যায়নের কারণে সেই অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে গোটা দুনিয়া। ধীরে ধীরে সেই জাহিলি যমানার দিকেই চলছে পৃথিবী। জাহিলি যমানা এবং বর্তমান সভ্যতা– এই দু'টি অবস্থাকে একসাথে রাখলে ইসলমী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় নারীদের মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়টা আমাদের নিকট একদম স্পষ্ট হয়ে যায়।

কেননা, যখন আরবের লোকেরা তাদের মেয়েদেরকে জ্যান্ত কবর দিতো এবং তাদেরকে জীবনের অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতো, তখন এই কাজকে মহাঅন্যায় সাব্যস্ত করে তা হারাম ঘোষণা দিয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর যখন জ্যান্ত প্রোথিত মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?"[৩৪]

---

[৩২] জামে তিমিযী, হাদীস নং- -১১৩ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৩৬মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৬২৩৮

[৩৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৪৮৯০ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪৬৮

[৩৪] সুরা তাকবীর, আয়াত নং-৯-৮

সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এই কাজটিকে অনেক বড় গুনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। "হযরত ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম- সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটা? তিনি বললেন- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এরপর কোনটা? তিনি বললেন- এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাবে। আমি আবার বললাম, এরপর কোনটা? তিনি বললেন- তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।"[৩৫]

ইসলামে নারীর অধিকারঃ

ইসলাম শুধু নারীর জীবন রক্ষার অধিকারের কথা বলেই চুপ থাকেনি; বরং একদম ছোট বেলা থেকেই বলেছে তাদের বিভিন্ন অধিকারের কথা। তাদেরকে দয়া করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যাকে কন্যা সন্তান দান করা হয়, আর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।"[৩৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন- "যে ব্যক্তির একটি কন্যা শিশু হলো, আর এ শিশুটিকে সে উত্তম শিক্ষা দিলো এবং আদর্শবান বানালো, ...তার জন্য দু'টি প্রতিদান।"[৩৭]

এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহে একদিন বিশেষকরে নারীদেরকে ওয়ায-নসিহত করতেন এবং তাদেরকে দ্বীনি হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন। আর তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দিতেন।[৩৮]

এরপর যখন মেয়েটার বয়স একটু বাড়ে এবং সে পূর্ণ যুবতীতে পরিণত হয়, তখন ইসলাম তার ব্যক্তিগত যেকোনো বিষয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নেয়া ও প্রত্যাখ্যান করার অধিকার প্রদান করে। ফলে যাকে সে চায় না, তার সাথে জোর করে তাকে বিবাহ দেয়া জায়েয হয় না।

---

[৩৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪২০৭
[৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬৪৯ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬২৯
[৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৭৯৫
[৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -১০১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৩৩

এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "বিধবা নারী (তার বিবাহের ক্ষেত্রে) অভিভাবকের তুলনায় নিজের উপর বেশি অধিকার রাখে। কুমারী নারীর কাছ থেকেও বিবাহের সম্মতি নিতে হবে। আর চুপ থাকাটাও তার সম্মতি।"[৩৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– "বিধবা নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তার অনুমতি কিভাবে নেয়া হবে? তিনি বললেন- তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।"[৪০]

কিছুদিন পর এই মেয়েটি যখন একজনের স্ত্রী হয়, তখন এই সত্য শরিয়ত তার স্বামীকে তার সাথে ভালো ব্যবহার ও কল্যাণকামিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কেননা, নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করাটা একজন পুরুষের ভদ্রতা ও উত্তম আখলাকের পরিচয় বহন করে। এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করে বলেন- "কোনো ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে পানি পান করায়, তখন এর বিনিময়েও তাকে সওয়াব দেয়া হয়।"[৪১]

নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আতংকিত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ বলেন– "হে আল্লাহ! এতিম এবং নারী- এই দুই দুর্বলের অধিকারের ব্যাপারে আমার ভয় হয়।"[৪২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুখেই বলেননি, এসব ব্যাপারে তিনি নিজে আমল করে এর বাস্তব-উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপন করে গেছেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সুহৃদয় ও পরম দয়ালু। হযরত আসওয়াদ ইবনে আবী নাখয়ী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তার স্ত্রীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন? হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা

---

[৩৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪২১
[৪০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৮৪৩
[৪১] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৭১৯৫
[৪২] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- -৩৬৭৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৯৬৬৪

বললেন– "তিনি ঘরে এসে তার স্ত্রীদেরকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতেন। এরপর যখন নামাজের সময় হতো; নামাজে চলে যেতেন।"[৪৩]

নারী যদি কোনো কারণে তার স্বামীকে অপছন্দ করে; তার সাথে জীবন-যাপন করা সম্ভব না হয়, তখন ইসলাম এই নারীকে খুলা'র[৪৪] মাধ্যমে উক্ত স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "হযরত সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন– হে আল্লাহর রাসুল! আমি সাবেতের দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে কোনো দোষ দিচ্ছি না, তবে আমি তার কুফুরির ব্যাপারে আশংকা করছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- তুমি কি তাকে ঐ বাগানটি ফিরিয়ে দিতে রাজি আছো, যা তোমাকে বিয়ের মহর হিসেবে দেয়া হয়েছিলো? সে বললো, হ্যাঁ, আমি রাজি আছি। পরে সে ঐ বাগানটি ফিরিয়ে দিল। অত:পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন, যাতে এই মহিলাকে ছেড়ে দেয়। তার স্বামী তাকে ছেড়ে দিলো।"[৪৫]

এছাড়াও ইসলাম নারীকে তার সম্পদের উপর পুরুষের মতই পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে। ফলে নারী বেচা-কেনা করতে পারে। ভাড়া দিতে পারে; নিতে পারে। কাউকে তার সম্পদের উকিল বানাতে পারে; আবার ইচ্ছা করলে কাউকে এমনিতেও দিতে পারে। নারী যদি পরিপূর্ণ বুঝমান হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তার উপর কেউ কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এদিকে ইঙ্গিত করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন– "তোমরা যখন তাদের বুঝমান হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে, তখন তাদের সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর করে দাও।"[৪৬]

একবার হযরত উম্মে হানী বিনতে আবী তালেব রাজিয়াল্লাহু আনহা এক মুশরিক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলেন। এতে তার ভাই হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু

[৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৬৪৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- -২৪২৭২ জামে তিমিযী, হাদীস নং-২৪৮৯

[৪৪] খুলা' অর্থ হলো– যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মুহাব্বাত না হয় এবং একসাথে সংসার করা কিছুতেই সম্ভব না হয়, আর স্বামীও তালাক দিতে না চায়; তখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে কিছু প্রদান করে তালাক নিয়ে নেয়া। (আল ইনায়াহ-৪৬৪/৫) -অনুবাদক

[৪৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৪৯৭৩ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬১৩৯

[৪৬] সুরা নিসা, আয়াত নং-৬

আনহু চরম অসন্তুষ্ট হলেন এবং ঐ মুশরিককে হত্যা করতে চাইলেন। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিচার চাওয়া হলে তিনি রায় দিয়ে বললেন– "হে উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম।"[৪৭]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অধিকার প্রদান করলেন– সে যুদ্ধাবস্থায় বা নিরাপদ অবস্থায় যেকোনো অমুসলিমকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিতে পারবে।

এভাবেই ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নত সভ্যতার অধীনে একজন মুসলিম নারী পরিপূর্ণ সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সাথে সুন্দর জীবন নিয়ে বাঁচতে পারে।

---

[৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৩০০০ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৩৬

ইসলামী সভ্যতায় শ্রমিকের অধিকার

ইসলামী সভ্যতায় শ্রমিক অধিকারের নমুনাঃ

ইসলাম শ্রমিক, কর্মচারী এবং কাজের লোকদেরকে সম্মানিত করেছে । তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিয়েছে। এমনকি ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাদের অধিকারের কথা স্বীকার করেছে। পূর্ববর্তী কোনো কোনো ধর্মে শ্রমিক হওয়ার অর্থ ছিলো- "নিজের স্বকীয়তা-স্বাধীনতা শেষ করে দিয়ে অন্যের গোলাম বা পরাধীন হয়ে যাওয়া।"

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিক হওয়ার মানে ছিলো– "নিন্দা, লাঞ্ছনা আর অপমান।"

পরবর্তীতে ইসলাম এসে সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের এই লাঞ্ছনাময় নিগৃহীত জীবন থেকে উদ্ধার করে এনে এক শৃঙ্খলময় সুন্দর জীবন উপহার দিয়েছে। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার শ্রমিক অধিকারের কথা বলেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উজ্জ্বল জীবনটাই ছিলো- ইসলামী সভ্যতায় শ্রমিকদের উপর দয়া-মায়া ও অধিকার বাস্তবায়নের এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মালিক পক্ষকে বলে দিয়েছেন– তারা যাতে কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে শালীনতার সাথে মানবিক আচরণ করে। তাদের প্রতি রহম করে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। আর তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ দিয়ে তাদেরকে কোনো কষ্ট না দেয়। তিনি বলেন– "তোমাদের কর্মচারী ও শ্রমিকরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই থাকে, সে যেনো তার ভাইকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাই যেনো পরায়, যা সে নিজে পরে। আর তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ দিয়ে যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয়। যদি তাদের দ্বারা কোনো ভারী কাজ করাতে হয়, তাহলে সে নিজেও যেনো তাদের সাথে সাহায্য করে।"[৪৮]

---

[৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৩০ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৬১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তোমাদের কর্মচারী ও শ্রমিকরা তোমাদের ভাই। এর মাধ্যমে তিনি শ্রমিকদেরকে শ্রমিকের স্তর থেকে তুলে এনে ভাইয়ের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আজ পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতায় এর কোনো নজীর পাওয়া যায় না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক পক্ষকে আরও আদেশ দিয়েছেন- তারা যেনো শ্রমিকদের সাথে কোনো রকম জুলুম-নির্যাতন ও টালবাহানা না করে শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে দেয়। এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন– "শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের কাজের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[৪৯]

শ্রমিকদের সাথে জুলুম করার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে। এক হাদীসে কুদসীতে[৫০] আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ তাআলা বলেছেন- কিয়মতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বো। একজন ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলো। আরেকজন ঐ ব্যক্তি, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করলো। আরেকজন হলো ঐ ব্যক্তি, যে কোনো শ্রমিক নিয়ে তার দ্বারা নিজের কাজ পূর্ণ করে নিলো, কিন্তু সে তার পারিশ্রমিক আদায় করলো না।"[৫১]

সুতরাং যারা কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে জুলুম করে, তারা যেনো এটা জেনে রাখে– আল্লাহ তাআলা সব দেখছেন, এবং কিয়ামতের দিন তিনি তার বিরুদ্ধে লড়বেন।

---

[৪৯] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- -২৪৪৩ মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-২৯৮৭

[৫০] যে হাদীসের মূল বক্তব্য সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার রাসুলকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নের মাধ্যতে জানিয়ে দিয়েছেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামনিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন, তাকে বলা হয় হাদীসে কুদসী।
কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য হলো– কুরআনের ভাব ও ভাষা উভয়টাই সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসীর ভাব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আর ভাষা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের।
আবার কেউ কেউ বলেন– হাদীরে কুদসীর ভাব ও ভাষা উভয়টাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। তবে তা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। (আল হাদীসু ওয়াল মুহদ্দিসুন, পৃষ্ঠা নং- ১৭-১৬) -অনুবাদক

[৫১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২১১৪ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৪৪২

অনুরূপভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকদেরকে এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন– তারা যাতে শ্রমিকদেরকে এমন কষ্টকর কোনো কাজ না দেয়, যার দ্বারা তাদের স্বস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয়। আর তারা কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন– "তুমি তোমার কর্মচারী বা শ্রমিক থেকে যে পরিমাণ কাজ হালকা করে দিবে, এর বিনিময়ে তোমাকে সে পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে।"[৫২]

ইসলামী শরিয়তে যে অধিকারকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়, সেটা হলো– শ্রমিকের সাথে বিনয় ও নম্রতার অধিকার। এক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করে বলেন– "সেই ব্যক্তির কোনো অহংকার নেই, যে তার কর্মচারী ও শ্রমিকের সাথে বসে খায়। যে গাধার পিঠে আরোহণ করে বাজারে যায় এবং বকরি বেধে তার দুধ দোহন করে।"[৫৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, স্বীয় জীবনেও তিনি তা পালন করেছেন। কখনও এর ব্যতিক্রম করেননি। হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি। না কোনো স্ত্রীকে, আর না কোনো কর্মচারী বা শ্রমিককে।"[৫৪]

একবার হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু তার গোলামকে প্রহার করলেন। পেছন থেকে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "হে আবু মাসউদ! জেনে রেখো, তুমি তার উপর যেমন ক্ষমতাবান, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর এরচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। তিনি বলেন, হঠাৎ এই কথা শুনে আমি চমকে যাই। পেছনে তাকিয়ে দেখি স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে আছেন। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর জন্য তাকে (গোলাম) আযাদ করে দিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু

[৫২] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং--৪৩১৪মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদীস নং-১৪৭২
[৫৩] আল আদাবুল মুফরাদ:৫৬৮ শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৮১৮৮
[৫৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -২৩২৮ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৪৭৮৬ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৯৮৪

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হ্যাঁ, যদি তুমি এটা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করে নিতো।"[৫৫]

সুতরাং প্রহার করা, চড় মারা, থাপ্পড় মারা, লাথি দেয়া– এগুলো হলো কর্মচারী বা শ্রমিকদেরকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্ত করা। আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো করতে একদম নিষেধ করে দিয়েছেন। এজন্য জুলুমবাজ মালিকের সেরা শাস্তি হলো– যার সাথে এসব আচরণ করবে, সাথে সাথে সে তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে। এটাই ইসলামের মাহাত্ম্য এবং ইসলামী সভ্যতার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু আনহু একটি বাস্তব সাক্ষ্য দিয়ে বলেন– "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। তিনি একদিন আমাকে এক কাজে পাঠালেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি যাবো না। কিন্তু বাস্তবে আমার অন্তরে ছিলো, আমি তার আদেশ করা কাজে যাবো। পরে আমি বের হয়ে গেলাম। বাজারে কিছু শিশু খেলা করছিলো। আমি সেখানে দাড়িয়ে গেলাম। পেছন থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার ঘাড়ে আলতোভাবে হাত রাখলেন। আমি তার দিকে তাকাতেই তিনি হেসে ফেললেন। অত:পর বললেন– যে কাজ করতে বলেছি, সে কাজে যাও। আমি বললাম, আমি যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসুল।

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– আমি সাত বছর বা নয় বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি, কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে তিনি কোনোদিন একথা আমাকে বলেছেন– তুমি এ কাজটা এভাবে কেনো করলে? আর এ কাজটা এভাবে কেনো করলে না?"[৫৬]

বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমদের প্রতি এ পরিমাণ খেয়াল রাখতেন যে, সময় হলে নিজ দায়িত্বে তাদেরকে বিবাহও করিয়ে দিতেন। হযরত রবীআ বিন কা'ব আসলামী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতাম। একদিন তিনি

---

[৫৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -১৬৫৯ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৫১৫৯ জামে তিমিযী, হাদীস নং-১৯৪৮

[৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -২৩১০সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৪৭৭৩

আমাকে বললেন, হে রবীআ! তুমি কি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার বিবাহ করার কোনো ইচ্ছা নেই। বিবাহ করার মত মহরও আমার কাছে নেই। আর আপনাকে ছেড়ে গিয়ে অন্য কিছু করাটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলেন- হে রবীআ! তুমি কি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার বিবাহ করার কোনো ইচ্ছা নেই। বিবাহ করার মত মহরও আমার কাছে নেই। আর আপনাকে ছেড়ে গিয়ে অন্য কিছু করাটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না। এ কথা শুনে তিনি আবারও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অত:পর আমি নিজেই বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! দুনিয়া ও আখেরাতে কোনটা আমার জন্য ভালো হবে, তা আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। আর আমি মনে মনে বললাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তৃতীয়বার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি আর না করবো না। অত:পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, হে রবীআ, তুমি কি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে তাই আদেশ করুন। আর আমার ব্যাপারে যা পছন্দ করবেন, আমি তাই করবো। অত:পর তিনি বললেন, তুমি আনসারী মহল্লার অমুক পরিবারে যাও.... ।”[৫৭]

ইসলামী সভ্যতায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের ব্যাপক মর্যাদার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন, যখন আমরা দেখি– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম-অমুসলিম সকল শ্রমিকদের প্রতিই সীমাহীন দয়া করতেন। এক্ষেত্রে তিনি মুসলিম-অমুসলিম কোনো পার্থক্য করতেন না।

এক ইহুদী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলাম হিসেবে তার খেদমত করতো। একবার এই গোলামটি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তার মাথার কাছে বসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন । গোলামটি তার পিতার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। পিতা বললো, তুমি আবুল কাসেমের (মুহাম্মাদ

[৫৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- -১৬৬২৭ আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং-২৭১৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা মেনে নাও। তখন গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর তার প্রাণপাখি উড়ে গেলো। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে সেখান থেকে চলে আসলেন– "সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান সত্তার, যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"[৫৮]

ইসলাম শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে, এখানে তার কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো। আর ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কথায়-কর্মে এসকল অধিকার বাস্তবায়ন করে গেছেন এমন এক মুহূর্তে, যখন মানুষ শ্রমিকদের সাথে জুলুম-অত্যাচার আর দুর্ব্যবহার ছাড়া ভালো কিছু কল্পনাই করতে পারতো না।

এসবের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য ও উদার মানবতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ।

[৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১২৯০

ইসলামে রোগী ও অভাবীদের অধিকার

ভূমিকাঃ

ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতায় রোগী ও অভাবীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে শরিয়তের অনেক হুকুম-আহকাম তাদের জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "অন্ধের কোনো দোষ নেই। লেংড়ার কোনো দোষ নেই। আর অসুস্থ ব্যক্তিরও কোনো দোষ নেই।"[৫৯]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের মনের হতাশা দূর করা হয়েছে এবং তাদের শারিরীক ও মানসিক অধিকার রক্ষা করা হয়েছে।

রোগীদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারও অসুস্থতার খবর পেতেন, সাথে সাথে তার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতেন। তিনি অনেক চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়তেন। রোগী দেখতে যেতে কেউ তাকে বাধ্য করতো না; বরং তিনি মনে করতেন, অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। আর এমনটা কেনই বা হবে না; তিনিই তো অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া রোগীর অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন– "মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো- অসুস্থ রোগীর সেবা করা।"[৬০]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর অসুস্থতা ও বিপদকে হালকা করার চেষ্টা করতেন। তার সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন। তাকে আশার বাণী শোনাতেন। তাকে মুহাব্বত করতেন। সাথে সাথে রোগী ও তার পরিবারকে সহায়তা করতেন। এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "একবার হযরত সা'দ বিন উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রাজিয়াল্লাহু আনহুম

---

[৫৯] সুরা নুর, আয়াত নং- -৬১ সুরা ফাতহ, আয়াত নং-১৭
[৬০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -১১৮৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২১৬২

সাথে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, পরিবারের সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-তার কি মৃত্যু হয়ে গেছে? তারা বললো, না, হে আল্লাহর রাসুল। অত:পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তাকে কাঁদতে দেখে পরিবারের লোকেরাও কেঁদে ফেললো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমরা কি শুনোনি? আল্লাহ তাআলা চোখের পানি আর অন্তরের ব্যথার কারণে শাস্তি দিবেন না। তিনি শাস্তি দিবেন এই জিনিসের কারণে–একথা বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন–অথবা এর কারণেই তিনি রক্ষা করবেন। আর নিশ্চয়ই পরিবারের লোকদের বিলাপ করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।"[৬১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর জন্য খুব দুআ করতেন। আর অসুস্থ হলে কী কী প্রতিদান বা সওয়াব পাওয়া যায়, এগুলো শোনাতেন। এগুলো শুনে রোগীরা নিজেকে অনেক হালকা মনে করতো এবং খুশি হতো। হযরত উম্মে আলা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন– একবার আমি অসুস্থ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। এসে বললেন- "হে উম্মে আলা! সুসংবাদ শোনো। কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার গুনাহগুলোকে এভাবে দূর করে দেন, যেভাবে আগুন স্বর্ণ-রূপার ময়লাকে দূর করে দেয়।"[৬২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে কষ্ট না দিয়ে তার আরামের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এক্ষেত্রে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "আমরা কয়েকজন একবার এক সফরে বের হলাম। আমাদের একজনের পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে গেলো। এরপর তার গোসল ফরজ হলো। এ ব্যাপারে সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলো- আমি কি এখন তায়াম্মুম করতে পারবো? জবাবে তারা বললো- তুমি যেহেতু পানি ব্যবহার করতে সক্ষম, তাই তোমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ নেই। অত:পর সে গোসল করলো এবং মারা গেলো। পরে আমরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তাকে এ ঘটনার কথা জানানো হলে তিনি বললেন– ঐ ব্যক্তিকে যারা হত্যা করেছে, আল্লাহ

---

[৬১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং -১২৪২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৯২৪

[৬২] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৩০৯২

তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যেহেতু জানে না, তাহলে কেনো তারা এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলো না! কেননা, অজ্ঞতার চিকিৎসাই তো হলো জিজ্ঞেস করা। আর ঐ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা যথেষ্ট ছিলো। তার জখমের উপর পট্টি বেঁধে তার উপর মাসাহ করে শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হতো।"[৬৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর যেকোনো প্রয়োজনে সাড়া দিতেন এবং প্রয়োজন পুরা হওয়া পর্যন্ত তার সাথেই থাকতেন। একবার তার নিকট এক মহিলা আসলো। মহিলা মাথায় একটু সমস্যা ছিলো। সে বললো- হে আল্লাহর রাসুল! আপনাকে আমার একটি প্রয়োজন পুরা করে দিতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "হে অমুকের মা, তুমি যেখানে চাও অপেক্ষা করো, আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দিচ্ছি। অত:পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু সময় দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন।"[৬৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী ও অভাবীদের জন্য চিকিৎসার অধিকার দিয়েছেন। কেননা, দেহ ও মনের সুস্থতা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিলেন– "হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা চিকিৎসা করো। কেননা, আল্লাহ তাআলা যত রোগ দিয়েছেন, তার সাথে সাথে চিকিৎসাও দিয়েছেন। শুধুমাত্র মৃত্যু ছাড়া।"[৬৫]

অনুরূপভাবে তিনি কোনো মহিলা চিকিৎসককে কোনো মুসলিম পুরুষের চিকিৎসা করতে নিষেধ করতেন না। তিনি নিজেই খন্দকের যুদ্ধে আসলাম গোত্রের এক মহিলা- হযরত রুফাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে হযরত সা'দ ইবনে মাআয রাজিয়াল্লাহু আনহু এর চিকিৎসায় নিযুক্ত করেছিলেন। এই

---

[৬৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং -৩৩৬ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং -৫৭২ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩০৫৭

[৬৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -২৩২৬মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৪০৭৮ সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৪৫২৭

[৬৫] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং -৩৮৫৫ জামে তিমিযী, হাদীস নং -২০৩৮ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৪৩৬

মহিলা সাহাবী জখমের চিকিৎসা খুব ভালো করতে পারতেন, এবং আহত মুসলমানদের চিকিৎসার জন্যই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[৬৬]

অভাবীদের অধিকার রক্ষার একটি বাস্তব নমুনা হলো– হযরত আমর ইবনুল জামুহ রাজিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উৎকৃষ্ট ব্যবহার। হযরত আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুব অভাবগ্রস্ত। তার পায়ে প্রচণ্ড সমস্যা থাকার কারণে তিনি ভালো করে হাটতে পারতেন না। তার চার ছেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু তার পায়ে সমস্যা থাকায় উহুদের যুদ্ধে ছেলেরা তাকে রেখে যেতে চাইলো। হযরত আমর ইবনুল জামুহ রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন- আমার পায়ে সমস্যা থাকার কারণে ছেলেরা আমাকে জিহাদে যেতে নিষেধ করছে। অথচ তারা আপনার সাথে জিহাদে যাচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার এই খোড়া পা নিয়েই জান্নাতে যেতে চাই।

অত:পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরকে বললেন- "আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে অসুস্থতা দিয়েছেন, এর কারণে তোমার উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। আর তার ছেলেদেরকে বললেন- তোমরা তাকে জিহাদে যেতে নিষেধ করো না। হয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাত নসীব করবেন।" এরপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জিহাদে শরীক হলেন, এবং উহুদের দিন শহীদ হয়ে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন- "ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আল্লাহর নামে কসম করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা পুরা করেন। যেমন আমর ইবনুল জামুহ। আমি তাকে দেখছি যে, সে খোড়া পা নিয়েই এখন জান্নাতে হাটছে।"[৬৭]

এই ছিল ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতায় রোগী ও অভাবগ্রস্তদের অবস্থা।

[৬৬] আল আদাবুল মুফরাদ: -১১২৯ সীরাতে ইবনে হিশাম:২৩৯/২
[৬৭] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৭০২৪

ইসলামী সভ্যতায় সংখ্যালঘুদের অধিকার

ভূমিকাঃ

ইসলামী শরিয়তের অধীনে মুসলিম সমাজে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে বিভিন্ন অধিকার ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। যা পূর্বে কোনো দেশে, কোনো ধর্মে এমনকি কোনো মানবরচিত আইনেও ছিলো না। এ অধিকারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ আর অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন– "যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, এবং তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণদেরকে পছন্দ করেন।"[৬৮]

এই আয়াতটি এমন মৌলিক নৈতিকতা ও নীতিমালার ধারণা দিয়েছে, যার ভিত্তিতে মুসলিমগন অমুসলিমদের সাথে আচার-ব্যবহার ও লেনদেন করবে। আর তা হলো– ঐ সকল সংখ্যালঘুদের সাথে সদয় ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করা, যারা তাদের শত্রু নয়। এগুলো এমন নীতিমালা- ইসলামের পূর্বে মানবসমাজ যা জানতই না। ফলে যুগযুগ ধরে সংখ্যালঘুরা হতাশা আর চরম মানবেতর জীবন যাপন করেছে। তাদের সাথে ছিলো না কোনো ভালো ব্যবহার, ছিলো না কোনো ন্যায়বিচার। অধুনা আধুনিক সমাজব্যবস্থাগুলিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার বাস্তবায়নের জোর চেষ্টা চলছে; কিন্তু প্রবৃত্তি, পক্ষপাত আর সাম্প্রদায়িকতার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

সংখ্যালঘুদের বিশ্বাসের স্বাধীনতাঃ

ইসলামী শরিয়ত অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে অসংখ্য অধিকার আর সুবিধা প্রদান করেছে। এর মধ্যে অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো– "তাদের স্বাধীন বিশ্বাসের অধিকার।" এক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন– "ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই।"[৬৯]

---

[৬৮] সুরা মুমতাহিনাহ, আয়াত নং-৮

[৬৯] সুরা বাকারাহ, আয়াত নং-২৫৬

এর বাস্তবরূপ প্রকাশ পেয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐ চিঠিতে, যা তিনি ইয়ামানের আহলে কিতাবদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। ঐ চিঠিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– "... যে ইহুদী বা খৃস্টান ইসলম গ্রহণ করবে, সে মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত। তাদের যা আছে, সব তাদেরই থাকবে । তারা নিজেদের মত করেই বাঁচবে। আর যারা ইহুদী বা খৃস্টবাদের উপরই বহাল থাকবে, তাদেরকে সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য করা হবে না।"[৭০]

ইসলামী শরিয়ত অমুসলিমদেরকে একদিকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা উপভোগ করতে দিয়ে অপরদিকে তাদের জীবনের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব হতে দেয়নি; বরং মানুষ হিসেবে তাদেরও জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ[৭১] কাউকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৭২]

অমুসলিমদের অত্যাচারে সতর্কতাঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের উপর জুলুম করা এবং তাদের অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। আর নিজেকে তিনি এসব জুলুমকারীদের বিপক্ষে দাড় করিয়েছেন । তিনি বলেন– "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ লোকের প্রতি জুলুম করবে, তাদের অধিকার খর্ব করবে, সাধ্যের বাইরে তাদের ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে দিবে, অথবা জোড়পূর্বক তাদের মাল কেড়ে নিবে; কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে দাড়াবো।"[৭৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্ষেত্রে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, খায়বারে এক আনসারী সাহাবীর হত্যার ঘটনার বিচার করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু খায়বারে ইহুদী অধ্যুষিত এক এলাকায় নিহত হন। ফলে সবাই প্রবল ধারণা করলো যে, এই হত্যা কোনো ইহুদীই করেছে। কিন্তু তাদের এই ধারণার পেছনে কোনো প্রমাণ

---

[৭০] সীরাতে ইবনে হিশাম: -৫৮৮/২ সীরাতুন্নাবাবিয়্যাহ, ইবনে কাসীর:১৪৬/৫

[৭১] চুক্তিবদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– জিম্মী অর্থাৎ মুসলিম সমাজে সংখ্যালঘু অমুসলিম । অথবা ঐ সকল অমুসলিম, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ। (আন নিহায়াহ:৬১৩/৩)

[৭২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৯৯৫ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-২৭৬০

[৭৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ৩০৫২ সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং-১৮৫১১

ছিলো না। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ইহুদীকে বিন্দুমাত্র শাস্তি দিলেন না। বরং তাদের থেকে শুধু এই কসম চেয়েছিলেন যে- তারা হত্যা করেনি। হযরত সাহল বিন আবী হাসমা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "তার গোত্রের একদল লোক খাইবারে গেলো। সেখানে গিয়ে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো। পরে তাদের একজনকে সেখানে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো। তারা ঐ এলাকাবাসীদেরকে বললো- তোমরা আমাদের সঙ্গীকে হত্যা করেছো। এলাকাবাসীরা বললো- আমরা তাকে হত্যা করিনি, আর কে তাকে হত্যা করেছে, তাও আমরা জানিনা ।

পরে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে বললো- হে আল্লাহর রাসুল! আমরা খাইবারে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের একজন সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমাদের মধ্যে যে বড়, তাকে কথা বলতে দাও। পরে তিনি বললেন- তাকে কে হত্যা করেছে, এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে পেশ করো। তারা বললো- আমাদের কাছে তো এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাহলে ইহুদীরা এ বিষয়ে কসম করবে যে- তারা এই হত্যা করেনি । তারা বললো- আমরা ইহুদীদের কসমের উপর আস্থা রাখি না। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিহতের রক্ত বৃথা যাওয়াকে পছন্দ করলেন না। তাই তাদেরকে রক্তপণস্বরূপ সদকার একশত উট দিয়ে দিলেন।"[৭৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে দৃষ্টান্ত দেখালেন, তা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি নিজ জিম্মায় মুসলমানদের মাল থেকে রক্তপণ আদায় করে দিলেন। যাতে আনসারীদের দিল শান্ত হয়। আর ইহুদের উপরও কোনো প্রকার জুলুম না হয়।

অতএব ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে এমনভাবে বিচারকার্য চালাতে হবে, যাতে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো ইহুদীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করা না হয়।

অমুসলিমদের সম্পদ রক্ষা করাঃ

[৭৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৫০২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৬৯

ইসলামী শরিয়ত অমুসলিমদের সম্পদ হেফজত করার পূর্ণ জিম্মাদারী নিয়েছে। এজন্য অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা এবং তাদের উপর জবরদখল করাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করাকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মত জুলুম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় নাজরানবাসীদের ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে– "নাজরান ও তার আশপাশের লোকদের ধন-সম্পদ, ধর্ম ও উপাসনাগৃহের উপর আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কমবেশী যা কিছু আছে সব তাদেরই থাকবে।"[৭৫]

অমুসলিমদের অধিকার আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তখন- যখন দেখা যায় ইসলমী রাষ্ট্র তাদেরকে অক্ষম, বয়স্ক ও গরীব অবস্থায় বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা করে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৭৬]

সুতরাং বুঝা গেলো, মুসলমানদের মত তাদের প্রতিও পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

তাদেরকে দান-সদকা করার ব্যাপারে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী পরিবারকে দান করতেন। আর তা ইহুদীদের কাছেও পৌছে দেয়া হতো।"[৭৭]

অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলাম যে মানবতা দেখিয়েছে, তা নজীরহীন। শুধুমাত্র ইসলামী সভ্যতায়ই এটা সম্ভব হয়েছে। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে

---

[৭৫] দালায়েলুন নবুওয়াহঃ -৪৮৫/৫ আত তাবাকাতুল কুবরা:২৮৮/১

[৭৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৪১৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮২৯

[৭৭] আল আমওয়াল লি আবী উবাইদ:৬১৩

দাড়ালেন। তাকে বলা হলো- "হে আল্লাহর রাসুল, এটা এক ইহুদীর লাশ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সে কি মানুষ নয়?"[৭৮]

এভাবেই ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতায় অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে সব ধরণের অধিকার দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো– "প্রত্যেকটি মানুষকে সম্মান করাই হলো প্রকৃত মানবতা; যতক্ষণ না সে তোমার উপর কোনো অন্যায় বা জুলুম করে।"

---

[৭৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৯৬১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৩৮৯৩

ইসলামী সভ্যতায় প্রাণীদের অধিকার

ভূমিকাঃ

ইসলাম সামগ্রিকভাবে বাস্তবতার নিরিখে প্রাণীদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। কেননা, জীবনধারণ ও মানবকল্যাণে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আর মহাবিশ্বের সুন্দর-সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় তাদেরও রয়েছে অসামান্য অবদান। এজন্য দেখা যায় আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রাণীর নামে পবিত্র কুরআনের অনেক সুরার নামকরণ করেছেন। যেমন সুরা বাকারা– গাভীর নামে। সুরা আনআম– চতুষ্পদ জন্তুর নামে। সুরা নাহল– মৌমাছির নামে। সুরা আনকাবুত– মাকড়শার নামে। ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে প্রাণীদের গুরুত্ব, বাসস্থান এবং মানুষের পাশে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– “আর চতুষ্পদ প্রাণীগুলোকে তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাতে রয়েছে উষ্ণতা লাভের উপকরণ এবং বিভিন্ন রকম উপকারিতা। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য; যখন সন্ধায় তা ফিরিয়ে আনো এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে পৌঁছা তোমাদের জন্য সম্ভব না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব অতি দয়াশীল ও পরম দয়ালু।”[৭৯]

ইসলামী শরিয়তে প্রাণীদের কিছু অধিকারঃ

ইসলামী শরিয়ত প্রাাণীদের যেসকল অধিকার দিয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো– “তাদেরকে কষ্ট না দেয়া।”

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক গাধার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। ঐ গাধাটির

---

[৭৯] সুরা নাহল, আয়াত নং-৭-৫

মুখে দাগ দেয়া হয়েছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "যে এই গাধাকে দাগ দিয়েছে, তার উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ।"[৮০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে কোনো প্রাণীর অঙ্গহানি করে।"[৮১]

আর এ বিষয়টা অর্থাৎ প্রাণীদেরকে কষ্ট দেয়া, শাস্তি দেয়া এবং তাদের সাথে নির্দয় ব্যবহার করা ইসলামী আইনে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অনুরূপভাবে ইসলামী শরীয়ত প্রাণীদের অধিকার রক্ষার্থে তাদেরকে বন্দী রাখা এবং অনাহারে রাখার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এক্ষেত্রে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "বিড়ালের কারণে এক মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ঐ মহিলা বিড়ালকে খাবার দিত না, পানি দিত না। আর তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে জমিনে কিছু কীটপতঙ্গ খেয়ে বাঁচবে।"[৮২]

হযরত সাহল ইবনে হানজালিয়্যাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক উটের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন; যার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিলো। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "তোমরা এসব বোবা প্রাণীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহণ করো এবং তাদেরকে ঠিকমতো খাবার দাও।"[৮৩]

অনুরূপভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন- যে প্রাণীকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে যেনো সে কাজেই ব্যবহার করা হয়। এরপর তিনি প্রাণী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন- "তোমরা তোমাদের পশুর পিঠকে মিম্বার বানানো হতে বিরত থাকো। কেননা, আল্লাহ পশুকে তোমাদের অনুগত করেছেন তোমাদের এক জনপদ থেকে আরেক

[৮০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২১১৭
[৮১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫১৯৬ সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং-৪৪৪২
[৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২২৩৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২২৪২
[৮৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ২৫৪৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৭৬৬২

জনপদে পৌছার জন্য। যেখানে তোমরা ভীষণ কষ্ট ছাড়া পৌছতে সক্ষম হতে না।"[৮৪]

ইসলামী শরিয়ত প্রাণীদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যা করেছে, তার মধ্যে আরেকটি হলো– "প্রাণীদেরকে অযথা হত্যার লক্ষ্যস্থল বানানো যাবে না।"

হযরত ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু একবার কিছু কুরাইশ যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখি বেঁধে তার উপর তীর নিক্ষেপ করছিলো। পরে তিনি বললেন- "যারা এরূপ করবে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন- যারা কোনো প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানায়।"[৮৫]

ইসলামী শরিয়ত প্রাণীদের অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতিটি অবলম্বন করেছে, তা হলো– "প্রাণীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা।"

এর একটি বাস্তব নমুনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন– "একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে একটি কূপে নেমে পানি পান করলো। সে কূপ থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো- একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবলো, কুকুরটারও আমার মত প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছে। সে কূপের ভেতর নামলো, এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে ধরে উপরে এসে কুকুরকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাআলা তার এই আমল কবুল করলেন এবং তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসুল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন– প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।"[৮৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "এক সফরে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি কোনো

---

[৮৪] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-২৫৬৭ সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং-সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং-১০১১৫

[৮৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫১৯৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৯৫৮

[৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং -৫৬৬৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২২৪৪

প্রয়োজনে একটু দূরে গেলেন। আমরা তখন দু'টি বাচ্চসহ একটি পাখি দেখতে পেয়ে বাচ্চা দু'টিকে ধরে নিলাম। মা পাখিটা সাথে সাথে আসলো এবং পাখা ঝাপটিয়ে বাচ্চার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন– কে এই পাখিটার বাচ্চা নিয়ে এসে তাকে অস্থিরতায় ফেলেছে? বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দাও।"[৮৭]

অনুরূপভাবে ইসলাম প্রাণীদের অধিকার রক্ষার্থে তাদেরকে উর্বর ভূমিতে চরাণোর নির্দেশ দিয়েছে। যদি নিজ এলাকায় উর্বর ভূমি না থাকে, তাহলে অন্য কোনো এলাকার উর্বর ভূমিতে পাঠিয়ে দিতে হবে, যাতে তাদের খাবারের কোনো কষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ তাআলা অতিনম্র। তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন। নম্রতায় তিনি সন্তুষ্ট হন। নম্রতার ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করেন, কিন্তু কঠোরতার ক্ষেত্রে করেন না। যখন তোমরা এসব বোবা প্রাণীর উপর আরোহণ করবে, তখন তোমরা এদের স্বাভাবিক মনজিলে নামাও। (অর্থাৎ স্বাভাবিক দূরত্বের বেশি চালিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিও না।) আর যেখানে বিশ্রাম করবে, সেখানকার জমিন যদি পরিস্কার হয়– ঘাস-পাতা না থাকে, তাহলে শীঘ্রই সেখান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাও। আর না হয় না খেয়ে তাদের হাড় শুকিয়ে যাবে।"[৮৮]

প্রাণীদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত শুধু দয়া আর নম্রতার কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরচেয়েও উপরস্থ আরেকটি অধিকার তাদেরকে দিয়েছে। সেটা হলো– "ইহসান বা তাদের কল্যাণ কামনা করা এবং তাদের অনুভূতিকে সম্মান করা।"

এই উত্তম আখলাকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে তখন, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খাওয়ার জন্য প্রাণী জবাই করার সময়েও তাদেরকে সব ধরণের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। চাই কষ্টটা হোক শারীরিকভাবে; ভুলভাবে ছুরি চালানোর মাধ্যমে বা ছুরিতে ধার না থাকার কারণে। অথবা কষ্টটা হোক মনের দিক দিয়ে;

---

[৮৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৫২৬৮
[৮৮] মুআত্তা মালেক, হাদীস নং-১৭৬৭

তাদেরকে ছুরি দেখানোর মাধ্যমে। কেননা, এসব বিষয় তাদের মৃত্যুর কষ্টটাকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি দু'টি জিনিস মনে রেখেছি। তিনি বলেন- "আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসানকে আবশ্যক করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা (জিহাদের ময়দানে শত্রুকে বা কিসাসস্বরূপ কাউকে) হত্যা করবে, তখন দয়ার সাথে হত্যা করো। যখন কোনো প্রাণীকে জবাই করবে, তখন দয়ার সাথে জবাই করো। তোমাদের সবাই যেনো ছুরি ভালোভাবে ধার দিয়ে নেয়, আর তার পশুকে যেনো কষ্টে না ফেলে।"[৮৯]

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– এক ব্যক্তি একটি বকরি জবাই করার জন্য তাকে শুইয়ে দিয়ে ছুরি ধার দিচ্ছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন– "তুমি কি এই প্রাণীকে কয়েকবার মারতে চাও? তুমি কেনো একে শোয়ানোর পূর্বেই ছুরি ধার দিলে না?"[৯০]

এই হলো ইসলামে প্রাণীদের অধিকার। যদি তারা ইসলামী সভ্যতার অধীনে আশ্রয় লাভ করে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে– শান্তি, নিরাপত্তা, আনন্দ ও স্বাধীন জীবনযাত্রা।

---

[৮৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৯৫৫ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-২৮১৫
[৯০] কিতাবুল আযাহী, হাদীস নং- ৭৫৬৩

ইসলামী সভ্যতায় পরিবেশের অধিকার

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে নির্মল-কোমল, কল্যাণকর ও পবিত্র এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন । আর তা মানুষের অনুকূল করে দিয়েছেন এবং তা হেফাজতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি নিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি এই মহাজাগতিক সর্বসুন্দর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাও করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন– "তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমি তা সৃষ্টি করেছি এবং তা সুশোভিত করেছি? তাতে কোনো ছিদ্রও নেই। আর আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি।"[৯১]

মানুষ এবং পরিবেশঃ

এভাবে একজন সুস্থ রুচির মানুষ ও তার চার পাশের নির্জীব ও জীবন্ত পরিবেশের সাথে এক মায়া-মুহাব্বত ও সখ্যতা গড়ে ওঠে। মানুষকে যথাসাধ্য পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হয়। কেননা, এটা দুনিয়াতে তাদের জন্যই উপকারী। এর মাধ্যমে একটি সাস্থ্যকর সুন্দর জীবন লাভ করা যায়। আর আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিদান।

পরিবেশ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা মহাবিশ্বের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিকেই আরও নিশ্চিত করে। যা মানুষ এবং প্রকৃতির মাঝে পারিবারিক সম্পর্ক ও মৌলিক বন্ধন তৈরী করেছে। আর এ বন্ধনের মূল ভিত্তি হলো ঈমান। যদি কোন ব্যাক্তি প্রকৃতির কোন উপাদানকে অপব্যবহার করে বা তা ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে এর দ্বারা সেই বিশ্বই সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেখানে সে বসাবস করছে ।

পরিবেশ রক্ষায় ইসলামী শরীয়তের কিছু নমুনাঃ

---

[৯১] সুরা ক্বাফ, আয়াত নং-৭-৬

ইসলামী শরীয়ত এই পৃথিবীতে অবস্থিত প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একটি ব্যপক নীতিমালা ঘোষণা করেছে, তা হলো– "এই মহাবিশ্বের কোন ধরনের ক্ষতি না করা।" যেমন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "ইসলাম কারও ক্ষতি হওয়া এবং কারও ক্ষতি করা কোন কোনটাকেই পছন্দ করে না।"[৯২]

ইসলামী শরিয়ত পরিবেশ নষ্ট করা এবং দূষিত করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ হতে বিরত থাকো। সেগুলো হলো– ১. পানির ঘাটে ২. চলার পথে ৩. কোনো কিছুর ছায়ায় পায়খানা করা।"[৯৩]

পরিবেশ রক্ষার্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাকে রাস্তার অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকো । সাহাবয়ে কেরাম বললেন, এছাড়া তো আমাদের কোনো উপায় নেই। কেননা, এটা আমাদের উঠাবসার জায়গা । এখানে বসে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমাদের যদি রাস্তার উপর বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার অধিকার আদায় করে বসবে । সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার অধিকার কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–....কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।"[৯৪]

এখানে কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা ঐ সকল বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে, রাস্তায় চলাচলের সময় যা মানুষের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং কষ্টের কারণ হয়।

আরেকটু আগে বেড়ে পরিবেশ রক্ষায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদান লাভের সুসংবাদও দিয়েছেন । তিনি বলেন– "আমার নিকট আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সব আমল পেশ করা হয়েছে । আমি তাদের ভালো আমলগুলোর মধ্যে দেখলাম, অন্যতম একটি ভালো আমল হলো– রাস্তা থেকে

---

[৯২] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২৭১৯ আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং-২৩৪৫
[৯৩] আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং-৫৯৪
[৯৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৩৩৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২১২১

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর মন্দ আমলগুলোর মধ্যে দেখলাম, অন্যতম একটি মন্দ আমল হলো– মসজিদে থুথু ফেলে তা পরিস্কার না করা।"[৯৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ীঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেন– "আল্লাহ তাআলা পবিত্র; তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন; পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। ... অতএব তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ীকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। আর তোমরা ইহুদীদের সাদৃশ অবলম্বন করো না।"[৯৬]

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ইসলামী শরিয়তের এসব চমৎকার নীতিমালা এবং উত্তম শিক্ষা মানুষকে সব ধরণের অপরিচ্ছন্নতা থেকে বেঁচে থাকতে উৎসাহ প্রদান করে। আর এর মাধ্যমে মানুষ শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিদায়ক সুন্দর একটি জীবন লাভ করতে পারে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক বক্তব্যে পরিবেশ সুন্দর রাখা এবং সর্বদা পরিপাটি হয়ে থাকার উপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । একবার এক সাহাবী এসে জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসুল! যদি আমি সুন্দর জামা আর সুন্দর জুতা পরি, তাহলে এটা কি অহংকার হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– "আল্লাহ তাআলা সুন্দর; তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। আর অহংকার তো হলো দম্ভ করে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ করা।"[৯৭]

আল্লাহ তাআলা যে চমৎকার এবং নির্মল পরিবেশ দান করেছেন, এ পরিবেশের যত্ন নেয়া নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত। যে সৌন্দর্যকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

অনুরূপভাবে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যে দেখতে পাই– সুগন্ধিসমূহ পছন্দ করা, মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়া, পরস্পরকে তা উপহার দেয়া এর মাধ্যমে পরিবেশকে মোহিত করা এবং দুর্গন্ধ দূর করা খুবই উৎকৃষ্ট কাজ। তিনি বলেন– "যার নিকট কোনো সুগন্ধি ফুল পেশ করা

---

[৯৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৫৩ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২১৫৮৯
[৯৬] জামে তিমিযী, হাদীস নং-২৭৯৯
[৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৯১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৭৮৯

হয়, সে যেনো তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, তা ওজনে হালকা আর ঘ্রাণে উত্তম।"[৯৮]

পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুনগুলো ইসলামী শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জমিতে চারা রোপণ করা এবং জমি চাষাবাদ করার উপর ইসলাম বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "কোনো মুসলমান একটি ফলের চারা রোপণ করলো, এরপর এই গাছ থেকে যেসব ফল খাওয়া হবে, এগুলো তার পক্ষ হতে সদকা। এই গাছ থেকে যা চুরি হবে, এগুলোও সদকা। বন্য পশুরা যা খাবে, তাও সদকা। পাখিরা যা খাবে, তাও সদকা। কেউ এসে অন্যায়ভাবে যা নিবে, তাও তার পক্ষ থেকে সদকা।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এই সদকা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।"[৯৯]

ইসলামের অন্যতম একটি মাহাত্ম্য হলো– পরিবেশ রক্ষার্থে যেসব চারা রোপণ করা হয়, যতদিন পর্যন্ত এসব চারা থেকে উপকার লাভ হয়, ততদিন পর্যন্ত তার সওয়াব হতে থাকবে। যদিও এর মালিকানা এই রোপণকারীর হাত থেকে অন্য কারও হাতে চলে যায় অথবা এই রোপণকারী বা চাষাবাদকারী মারা যায়।

কোনো ব্যক্তি যদি গাছ রোপণ করে, বীজ ফেলে বা পানি সিঞ্চন ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো অনাবাদী জমিনকে আবাদ করে তোলে, তাহলে এ ব্যাপারেও রয়েছে ইসলামী শরিয়তের উত্তম দিকনির্দেশনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "যদি কেউ অনাবাদী জমিনকে আবাদ করে, তাহলে সে জমিন তার। আর পশু-পাখি সেখান থেকে যা খাবে, এটা হবে তার পক্ষ থেকে সদকা।[১০০]

পানি হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাই পানিকে পরিমিত ব্যয় করা এবং তা সংরক্ষণ করা ইসলামের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানি যদি প্রচুর পরিমাণেও মওজুদ থাকে, তবুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পরিমিতভাবে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[৯৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -২২৫৩ জামে তিমিযী, হাদীস নং-২৭৯১
[৯৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -১৫৫২ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৭৪০১
[১০০] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং -৫৭৫৬ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৪৩১০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত সাদ[১০১] রাজিয়াল্লাহু আনহু এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন- যখন তিনি উযু করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "হে সাদ! এই অপচয় কেনো? সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন- পানির মধ্যেও অপচয় আছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহিত নদীতে উযু করো।"[১০২]

অনুরূপভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদ্ধ পানিতে পেশাব করে পানি নষ্ট করতেও নিষেধ করেছেন।[১০৩]

এই ছিলো পরিবেশ রক্ষায় ইসলামী সভ্যতার সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টিভঙ্গিটি পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুস্থ্য-সুন্দর ও নিরাপদ রাখতে সহায়তা করে।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সুন্দর পৃথিবী এবং সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে পৃথিবীতে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা এবং সংহতির মাধ্যমে। আর এই সুন্দর পরিবেশ রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে।

---

[১০১] তার পুরা নাম- সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ইবনে উহাইব আয যুহরী। তিনি ছিলেন আশারা মুবাশশারার একজন। (উসদুল গাবাহ:২/৪৩৩)

[১০২] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- -৪২৫ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৭০৬৫

[১০৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮১ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৬৯

ইসলামে ধর্মের স্বাধীনতা

ধর্মের স্বাধীনতায় ইসলামের মৌলিক নীতিঃ

ইসলামে ধর্মের স্বাধীনতা বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন– "দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কারও কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হেদায়াত আর ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।"[১০৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী মুসলমানগণ কাউকেই জোর করে মুসলিম হতে বাধ্য করেননি। আবার যারা মৃত্যুর ভয়ে বা শাস্তি থেকে বাচাঁর জন্য ইসলাম গ্রহণের ভান ধরেছে, তাদেরকেও প্রশ্রয় দেননি। আর এটা তারা কিভাবে করবেন? কেননা, তারা তো জানেন যে, বাধ্য হয়ে লোক দেখানোর জন্য উপরে উপরে ইসলাম গ্রহণের পরকালে কোনোই মূল্য নেই। অথচ এই আখেরাতের জন্যই তো মুসলমানের সকল চেষ্ট-প্রচেষ্টা!

পূর্বোক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে– হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জাহিলী যুগে যদি কোনো মহিলার সন্তান বেঁচে না থাকতো, তাহলে সে এভাবে মানত করতো– "যদি এবার তার সন্তান বাঁচে, তাহলে তাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করাবে।" পরে যখন ইহুদী গোত্র বনু নাজিরকে উচ্ছেদ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে আনসারদের ঐসব ইহুদী সন্তানরাও ছিলো। ফলে আনসাররা বললো– আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ইহুদীদের সাথে ছাড়বো না। পরে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন– "দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কারও কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হেদায়াত আর ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।"[১০৫]

ঈমান ও মানুষের ইচ্ছাঃ ইসলাম ঈমান আনা এবং না আনাকে মানুষের ইচ্ছা ও আন্তরিক অভিপ্রায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "যে চায় সে ঈমান আনবে, আর যে চায় সে কুফুরী করবে।"[১০৬]

---

[১০৪] সুরা বাকারাহ, আয়াত নং-২৫৬
[১০৫] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ২৬৮২
[১০৬] সুরা কাহাফ, আয়াত নং-২৯

পবিত্র কুরআনও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টিকে এই বাস্তবতার দিকেই ফিরিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্পষ্ট বলা হয়েছে- "তার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া। মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামে দাখিল করা তার দায়িত্ব না।" পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "আপনি কি মানুষকে বাধ্য করবেন, যাতে তারা মুমিন হয়?"[১০৭]

আরও বলা হয়েছে– "আপনি তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন।"[১০৮]

আরও বলা হয়েছে– "আর যদি তারা ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। (বরং শুধু) দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই আপনার দায়িত্ব।"[১০৯]

এগুলোর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মুসলিম সংবিধান 'বিশ্বাসের স্বাধীনতা' বা 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'কে নিশ্চিত করেছে। আর কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে।

ইসলামে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাঃ

ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ হলো ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা। মদীনার প্রথম সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। তিনি ইহুদীদেরকে এমন স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা মুসলমানদের সাথে এক জাতি হিসেবে বসবাস করতো। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শক্তিশালী এবং বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও কুরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন– "যাও তোমরা আজকে স্বাধীন।"[১১০]

তার পদাংক অনুসরণ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুও জেরুজালিমের খৃষ্টানদেরকে তাদের জীবন, গির্জা এবং ক্রুশের নিরাপত্তা

---

[১০৭] সুরা ইউনুস, আয়াত নং-৯৯
[১০৮] সুরা গাশিয়াহ, আয়াত নং-২২
[১০৯] সুরা শুরা, আয়াত নং-৪৮
[১১০] সীরাতে ইবনে হিশামঃ -৪১১/২ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহঃ৩০১/৪

দিয়েছিলেন। তাদের কারও কোনো ক্ষতি করা হয়নি। তাদের ধর্মের কারণেও তাদেরকে কোনো রকম জবরদস্তি করা হয়নি।[১১১]

বরং ইসলাম প্রতিপক্ষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা না করে বস্তুনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে নবী! আপনি আপনার রবের দিকে মানুষকে আহ্বান করুন হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়।"[১১২]

সুতরাং এই সহনশীল নীতির ভিত্তিতেই মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে কথাবার্তা হওয়া উচিৎ।

আহলে কিতাবদের সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআন এই দাওয়াতের দিকেই আহ্বান করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে– "হে নবী আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এমন কথার দিকে আসো, যা আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সমান। তা হলো- আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবো না। তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ ছাড়া আমরা কেউ কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। তারপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে বলে দেন- তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলমান।"[১১৩]

এর অর্থ হলো– অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়ে যখন কোনো ফল পাওয়া যাবে না, তখন তাদেরকে আপন ধর্মের উপরই ছেড়ে দেয়া হবে। যা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে। আর এই বিষয়টাকেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সুরা কাফিরুনের শেষ আয়াতে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে কথার মাধ্যমে মুশরিকদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তা হলো– "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।"[১১৪]

---

[১১১] তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক:৩/১০৫
[১১২] সুরাতু নাহল, আয়াত নং-১২৫
[১১৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৬৪
[১১৪] সুরা কাফিরুন, আয়াত নং-৬

ইসলামী সভ্যতায় চিন্তার স্বাধীনতা

ইসলামে চিন্তার মূল্যায়নঃ

ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে এবং একে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছে। স্বয়ং ইসলামী সভ্যতাই এর বাস্তব সাক্ষী। এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয় তখন, যখন দেখা যায় ইসলাম সমগ্র বিশ্ব এবং আসমান-জমিন নিয়ে চিন্তার আহ্বান জানিয়েছে এবং এর উপর খুব উৎসাহ প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বাণী– "আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর জন্য দু'জন অথবা একজন করে ছড়িয়ে যাও, অতপর চিন্তা করে দেখ...।"[১১৫]

তিনি আরও বলেন– "তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? (যদি করতো) তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয়, যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারতো এবং হতো এমন কান, যা দ্বারা তারা শুনতে পারতো। মূলত চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বুকের মধ্যে থাকা হৃদয়।"[১১৬]

ইসলাম বিবেক ও যৌক্তিক প্রমাণে উৎসাহিত করেঃ

ইসলাম ঐ সমস্ত লোকদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, যারা তাদের বিবেক এবং অনুভূতিশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে অলস বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম তাদের মর্যাদাকে চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও নিচে নামিয়ে দিয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন– "তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা বুঝে না। চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। আর তারাই হচ্ছে গাফেল।"[১১৭]

ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে, যারা শুধু ধারণা আর অনুমান নিয়ে পড়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন– "তারা তো

[১১৫] সুরা সাবা, আয়াত নং-৪৬
[১১৬] সুরা হাজ্ব, আয়াত নং-৪৬
[১১৭] সুরা আরাফ, আয়াত নং-১৭৯

কেবল ধারণারই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয়ই ধারণা সত্যের মোকাবেলায় কোনোই কাজে আসে না।"[১১৮]

ইসলাম তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঐ সমস্ত লোকদেরকেও, যারা তাদের বাপ-দাদা এবং নেতাদের অনুসরণ করে। কিন্তু এটা চিন্তা করে না যে, তারা কি হকের উপর আছে, না বাতিলের উপর। পবিত্র কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে– "(কিয়ামতের দিন) তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা তো আমাদের সর্দার এবং বড়দের অনুসরণ করেছি। আর তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।"[১১৯]

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম যৌক্তিক প্রমাণের অনুমোদন দিয়েছে। এজন্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন– আকল বা বিবেক হলো নকলের (কুরআন-হাদীস) ভিত্তি। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বিষয়টি প্রমাণ হয় আকলের মাধ্যমে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওতের বিষয়টিও প্রথমে প্রমাণ হয়েছে আকলের মাধ্যমে। এরপর বিভিন্ন মোজেজা তার সত্য নবী হওয়ার উপর প্রমাণ হিসেবে এসেছে। এই হলো ইসলামে চিন্তা বা আকলের মর্যাদা।

ইসলামে চিন্তার মূল্যায়নঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা হলো দ্বীনের একটি অংশ। সর্বাবস্থায় চিন্তামুক্ত থাকা একজন মুসলমানের জন্য জায়েয নেই। দ্বীনি বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করার জন্য ইসলাম এক বিশাল দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কেননা, জীবন-ঘনিষ্ঠ নতুন নতুন বিষয়ের শরয়ী সমাধান বের করার জন্য চিন্তা ও গবেষণা করতে হয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এর নামই দিয়েছেন– ইজতিহাদ অর্থাৎ শরয়ী হুকুম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য চিন্তা-ভাবনা।

ইজতিহাদের মূলনীতি–যা ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে–মুসলমানদের আইনশাস্ত্রে এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। আর তা ঐ সকল মাসআলা-মাসায়েলের দ্রুত সমাধান দেয়, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিলো

[১১৮] সুরা নাজম, আয়াত নং-২৮
[১১৯] সুরা আহযাব, আয়াত নং-৬৭

না। এখান থেকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ ফিকহী মাযহাবও তৈরি হয়েছে। তখন থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব তাদের অনুসরণ করে আসছে।

এভাবেই মুসলমানদেরকে তাদের দুনিয়া এবং দ্বীনের ঐ সকল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট কিছু নেই। এটা হলো ইসলামের সুদৃঢ় যৌক্তিক অবস্থানের প্রথম স্তম্ভ। এই অবস্থানটি সেই ভিত্তির মতো, যার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস জুড়ে মুসলমানগণ তাদের সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো।

ইসলামী সভ্যতায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা

ভূমিকাঃ

ইসলামী সভ্যতায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে বুঝায়– "প্রত্যেক ব্যক্তি সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো বিষয়ে সে তার পছন্দমত মতামত গ্রহণ করতে পারে, এবং জনসম্মুখে তা প্রচার করতে পারে। এটা তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশের ব্যক্তিগত অধিকার। যতক্ষণ পর্যন্ত এর মাধ্যমে অন্য কারও অধিকারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না হবে।"

মত প্রকাশের স্বাধীনতা মুসলমানের অধিকারঃ

ইসলামী সভ্যতায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো একজন মুসলমানের নিশ্চিত অধিকার। কেননা, ইসলামী শরিয়ত এ অধিকারকে শুধু মুসলমানদের জন্যই নিশ্চিত করেছে। আর ইসলামী শরিয়ত যখন কারও জন্য কোনো বিষয় নিশ্চিত করে, তখন অন্য কেউ তা হ্রাস করা, দূর করা বা অস্বীকার করার কোনো অধিকার রাখে না।

শুধু তাই নয়, বরং স্বাধীন মত প্রকাশ করা একজন মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এর থেকে বিরত থাকা তার জন্য জায়েয নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব করেছেন– অন্যের কল্যাণ কামনা করা, সৎ কাজের আদেশ করা আর অসৎ কাজের নিষেধ করা। আর এই ওয়াজিবগুলো পালন করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান পূর্ণ মত প্রকাশের স্বাধীনতা না পাবে। সুতরাং মত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো এসব ওয়াজিব আদায়ের অন্যতম একটি মাধ্যম। আর যে জিনিস ব্যতীত ওয়াজিব আদায় করা সম্ভব হয় না, সে জিনিসটাও ওয়াজিব হয়ে যায়। সে হিসেবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ওয়াজিব।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়সহ দুনিয়াবি সকল বিষয়ে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলাম। এ বিষয়ে একটি বাস্তব নমুনা– খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুরের বিনিময়ে গাতফানীদের সাথে সন্ধি করার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ বিন মুআয ও হযরত সাদ বিন উবাদাহর সাথে পরামর্শ করেছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "একবার হারেস গাতফানী রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! মদীনার খেজুর আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নাও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি সাদদের সাথে পরামর্শ করে নেই। এরপর তিনি হযরত সাদ ইবনে মুআয, সাদ ইবনে উবাদাহ, সাদ ইবনে রাবী, সাদ ইবনে খাইসাম এবং সাদ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন– আমি জানি যে আরব তোমাদেরকে এক ধনুক থেকে বের করে দিয়েছে। এখন হারেস গাতফানী চায় তোমরা মদীনার খেজুরগুলোকে তার সাথে ভাগাভাগি করে নাও। এখন তোমরা যদি এই বছরই তাকে দিতে চাও, তাহলে তা ভেবে দেখতে পারো। জবাবে তারা বললো- হে আল্লাহর রাসুল, এটা কি আসমান থেকে আসা ওহী; যা আমাদেরকে মানতেই হবে, না আপনার নিজস্ব কোনো মতামত; যা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে? আপনি যদি আমাদের মতামতের উপর বিষয়টি ছেড়ে দেন, তাহলে আল্লাহর কসম করে বলছি, এ ব্যাপারে আমাদের মতামত হলো– তারা আতিথেয়তা আর অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের কাছ থেকে একটি খেজুরও পাবে না।"[১২০]

কল্যাণ কামনা, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধঃ

অপরের কল্যাণ কামনা করা, সৎ কাজে আদেশ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে অনেক বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে আর অসৎ কাজের নিষেধ করে।"[১২১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "প্রকৃত দ্বীন হলো- অন্যের কল্যাণ কামনা করা। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা বললাম– হে আল্লাহর রাসুল! কার জন্য কল্যাণ কামনা করবো? তিনি বললেন– আল্লাহ তাআলার জন্য, তার রাসুলের জন্য, মুসলিম ইমামদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য।"[১২২]

---

[১২০] আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং- -৫৪১৬ মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং-১১৯/৬
[১২১] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-৭১
[১২২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -৮২ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৪৯৪৪ সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং- ৪১৯৭

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী[১২৩] রহ: বলেন– "মুসলিম ইমামদের কল্যাণকামিতার অর্থ হলো- ন্যায়ের ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করা, তাদের আনুগত্য করা, অন্যকে এর আদেশ করা, তাদের বিরোধিতা করতে নিষেধ করা, ভদ্রতার সাথে তাদের আলোচনা করা, আর মুসলমানদের যেসব অধিকার আদায়ে তারা গাফেল হয়ে যায়, সেসব ক্ষেত্রে নম্রতার সাথে তাদেরকে অবগত করা।"[১২৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "কোনো মানুষের ভয় যেনো কাউকে জেনে-বুঝে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে।"[১২৫]

তিনি আরও বলেন– "অত্যাচারী বাদশাহর সামনে হক কথা বলা উত্তম সংগ্রাম।"[১২৬]

সৎ কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করার আবশ্যকতা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আবশ্যক করে দেয়। আর আল্লাহ তাআলা সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করাকে ওয়াজিব করেছেন। এর মানে তিনি মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আমীরের জন্য মাশওয়ারা বা পরামর্শ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি, যাদের সাথে পরামর্শ করবে, তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ওয়াজিব করে। কেননা, তারা যদি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে আমীর তাদের সাথে কী পরামর্শ করবে!

ইসলামী ইতিহাসজুড়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অনেক বাস্তব নমুনা পাওয়া যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুবাব বিন মুনযির রাজিয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থানের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত পেশ করেছিলেন, যা ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১২৩] তার নাম- মুহিউদ্দীন আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আন-নববী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬৩১ হিজরি মোতাবেক ১২৩৩ খৃস্টাব্দে। তিনি ছিলেন ইসলামী আইন ও হাদীসের উপর বিশেষ পারদর্শী। তার অন্যতম প্রসিদ্ধ কিতাব হলো- আল মিনহাজ ও রিয়াজুস সালেহীন। তিনি ৬৭৬ হিজরি মোতাবেক ১২৭৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ:১৩/২৭৮)

[১২৪] আল মিনহায৩৮/২

[১২৫] জামে তিমিযী, হাদীস নং- -২১৯১ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৯৯৭

[১২৬] জামে তিমিযী, হাদীস নং- -২১৭৪ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৪৩৪৪

ওয়াসাল্লাম এর মতামতের বিপরীত। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মতামতকেই গ্রহণ করলেন।

অনুরূপভাবে ইফকের ঘটনার সময় কিছু সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মতামত দিয়েছিলেন- যাতে তিনি হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দিয়ে দেন। পরে পবিত্র কুরআন হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছে।

এছাড়াও আরও অনেক ঘটনা এমন আছে, যেখানে দেখা যায়, হযরত সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী লোকগণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত পেশ করেছেন।

এসব আলোচনার দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী শরিয়তে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত পেশ করাটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার। সুতরাং স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া জায়েয নেই। কেননা, এই অধিকার তাকে শরিয়তই দিয়েছে।

হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু একবার মসজিদের মিম্বারে বসে মহিলাদের মহর নিয়ে আলোচনা করলেন। এক মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করে বসলো। হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন- "তাকে কিছু বলো না। এর দ্বারা তিনি স্বীকার করে নিলেন, এই মহিলাই সঠিক বলেছে। এরপর তিনি বললেন- এই মহিলা সঠিক মাসআলা বলেছে আর উমর ভুল করেছে।"[১২৭]

মত প্রকাশে আমানতদারী ও সততাঃ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আমানতদারী এবং সততাকে ঠিক রাখবে। যা তিনি সঠিক মনে করেন, তাই বলবেন। যদিও সঠিক বলাটা তার জন্য অনেক কষ্টকর হয়। কেননা, স্বাধীন মত প্রকাশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- সত্য ও সঠিক বিষয়টা সামনে আসা এবং শ্রোতা এর থেকে উপকার লাভ করা। ধোকা, প্রতারণা এবং সত্য গোপন করা স্বাধীন মত প্রকাশের উদ্দেশ্য নয়।

---

[১২৭] তাফসীরে কুরতুবী:৯৫/৫

মত প্রকাশের সময় কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখবে। শুধু নিজের সুনাম-সুখ্যাতি, সঠিক ক্ষেত্রে ঝামেলা সৃষ্টি করা, বাতেলকে হকের চাদরে ঢেকে দেয়া, মানুষের অধিকারের অবমূল্যায়ন করা, আমীরদের খারাপ বিষয়কে বড় করা, আর তাদের ভালো বিষয়গুলোকে ছোট করা, তাদের ব্যক্তিত্বকে খাটো করা, তাদের সুখ্যাতিকে কমিয়ে দেয়া এবং মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার জন্য মত প্রকাশ করবে না। এসব শর্তের ভিত্তিতেই ইসলামী শরিয়ত মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে। এটি হলো একটি সভ্যতার উন্নতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সাথে সাথে এটা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও অন্যতম হাতিয়ার।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গোলাম আযাদ

ভূমিকাঃ

ইসলাম এসেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রকৃত সম্মান ফিরিয়ে দিতে। ইসলামে মানব-সন্তান সবাই সমান। তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় হবে শুধুমাত্র তাকওয়া– খোদাভীতির মাপকাঠিতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর বর্ণবাদ আর জাতিয়তাবাদের দেয়াল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বর্ণ-বৈষম্য পুরোপুরিভাবে দূরীভূত হওয়ার বাস্তব নমুনা দেখা যায়– যখন হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু কাবার ছাদে উঠে চিৎকার করে কালেমায়ে তাওহীদের আওয়াজ দিয়েছেন। আর এর পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো ভাই হামজা এবং পালকপুত্র যায়েদকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

বিদায় হজ্ব এবং সাম্য নীতিঃ

বিদায় হজ্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মাঝে সমতার ঘোষণা দিয়ে বলেন– "তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদম আলাইহিসসালাম মাটির তৈরি। অনারবীর উপর কোনো আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের উপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র তাকওয়া– খোদাভীতির ভিত্তিতে।"[১২৮]

এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গোলামি প্রথা বিলুপ্তির আহ্বান করা হয়েছে।

ইসলামের মূলনীতি হলো– "সকল মানুষ স্বাধীন। কেউ পরাধীন বা গোলাম নয়। কেননা, প্রত্যেকেই এক পিতার অন্তর্ভূক্ত আর জন্মগতভাবে সবাই স্বাধীন।"

ইসলাম এমন এক জমানায় এই মূলনীতি ঘোষণা করেছে, যখন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখা হতো আর বিভিন্ন ধরণের অপমান-লাঞ্ছনা আর বন্দী জীবনের স্বাদ আস্বাদন করানো হতো।

---

[১২৮] শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৪৯২১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং--২৩৫৩৬

ইসলাম এবং গোলাম আযাদঃ

ইসলাম আগমনের পূর্বে মানবজাতি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা আর সভ্যতার ছায়ায় জীবন যাপন করেছে– যেখানে ছিলো পৌত্তলিক নাগরিক ব্যবস্থা, সংকীর্ণমনা উপজাতি তত্ত্ব, আর শ্রেণীবৈষম্যের ছড়াছড়ি। যা গোটা মানব সভ্যতাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো। এর মূলে ছিলো সমাজের এলিট শ্রেণীর ঐ সমস্ত লোক, যারা নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকার ভোগ করতো। আর সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সুন্দর জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার হরণ করে নিজেদের আয়ত্বে রাখতো। কোনো রকম দয়া-মায়া তাদেরকে করা হতো না।

এরপর ইসলাম এসে মুসলমানদেরকে বললো– গোলাম আযাদ করতে, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে, তাদেরকে অনুগ্রহ আর ক্ষমা করতে। সাথে সাথে গোলাম আযাদ করাকে অনেক বড় এক আমল হিসেবেও গণ্য করে দিলো।

ইসলাম মুসলমানদেরকে আহ্বান করলো– তারা যেনো নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করে গোলাম আযাদ করে।

মালিক পক্ষের জন্য গোলামের সাথে জুলুম করা বা প্রহার করার কাফফারা নির্ধারণ করে দিলো– গোলাম আযাদ।

গোলাম আযাদ করাকে সওয়াবের কাজ গণ্য করলো। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা, যেহার,[১২৯] কসম ভঙ্গ এবং রমজানের রোজা ভঙ্গের কাফফারা নির্ধারণ করে দিলো– গোলাম আযাদ।

আবার ইসলাম মালিকদেরকে আদেশ করেছে, যদি কোনো গোলাম মুক্তি পাওয়ার জন্য মুকাতাবা (টাকার বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি) করতে চায়, তাহলে তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবে। এমনকি গোলম আযাদের জন্য টাকা খরচ

---

[১২৯] যেহার মানে হলো– নিজের স্ত্রী বা তার কোনো বিশেষ অঙ্গকে নিজের মা বা তার কোনো চিরস্থায়ী গাইরে মাহরাম মহিলার কোনো অঙ্গের সাথে সাদৃশ্য দেয়া। যেমন: কেউ তার স্ত্রীকে বললো- তুমি আমার মায়ের মত। বা তুমি আমার মায়ের পেট বা পিঠ বা রানের মত। (তুহফাতুল ফুকাহা:২/২১১) -অনুবাদক

করাকে যাকাতের মাসরাফ (যেখানে যাকাত দেয়া যায়) বানানো হয়েছে। আর মালিকের মৃত্যুর পর উম্মুল ওয়ালাদকে[১৩০] আযাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

গোলামীর সমস্যা সমাধানে ইসলামের ব্যবস্থাপনাঃ

গোলামীর সমস্যা একটি মানবতার সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে ইসলাম তিন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংক্ষেপে যা নিম্নরূপ:

১. যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল গোলামীর উৎস বন্ধ করে দিয়েছে।
২. গোলাম আযাদের অনেক দিক বর্ণনা করেছে।
৩. মুক্তির পর তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে।

ইসলামী শরিয়ত মুসলিম সম্প্রদায়কে গোলম আযাদ করার ব্যাপারে সীমাহীন উৎসাহিত করেছে এবং পরকালে এর বিনিময়ে প্রতিদানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি গোলম আযাদ করবে, আল্লাহ তাআলা গোলামের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। এমনকি গোলামের গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে তার গুপ্তাঙ্গকেও।"[১৩১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদী মুক্ত করা এবং তাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে বলেন– "যে ব্যক্তির বাঁদী আছে, আর সে তাকে খুব ভালো শিক্ষা দিলো এবং উন্নত আখলাক ও উত্তম শিষ্টাচার শেখালো, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করে নিলো; তার জন্য রয়েছে দু'টি[১৩২] প্রতিদান।"[১৩৩]

---

[১৩০] উম্মুল ওয়ালাদ বলা হয় ঐ বাঁদীকে, মুনীব কর্তৃক যে কোনো সন্তানের মা হয়।
[১৩১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৬৩৩৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৫০৯
[১৩২] একটি প্রতিদান আযাদ করার কারণে। অপরটি বিবাহ করার কারণে। (ইরশাদুস সারী:৮/১৫) -অনুবাদক
[১৩৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৭৯৫

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই বিন আখতাব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে আযাদ করে বিবাহ করেছিলেন। আর এই আযাদীটাই তার বিবাহের মহর ছিলো।[১৩৪]

গোলামদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহমর্মিতা এবং তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন নসীহতই ছিল সমাজে গোলাম আযাদ হওয়ার মূল চাবিকাঠি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদেরকে ডাকার বেলায়ও সুন্দর নামে ডাকতে বলেছেন। তিনি বলেন– "তোমাদের কেউ যেনো এভাবে না বলে– আমার দাস, আমার দাসী। কেননা, তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর দাস আর প্রত্যেত নারীই আল্লাহর দাসী। বরং তোমরা এভাবে বলবে– আমার গোলাম, আমার বাঁদী অথবা আমার সেবক, আমার সেবিকা।"[১৩৫]

ইসলাম মালিকদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছে- তারা যেনো তাদের গোলামদেরকে ভালো খাবার দেয়, ভালো পোষাক দেয়, আর তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ তাদেরকে দিয়ে না করায়।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকদেরকে ভালোভাবে নসীহত করে বলতেন– "তোমরা যা খাও, তাদেরকে তা খাওয়াও। তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকে তা পরিধান করাও। আল্লাহর মাখলুককে তোমরা কষ্ট দিও না।"[১৩৬]

এছাড়াও ইসলাম গোলামদেরকে এমন এমন অধিকার দিয়েছে, যার দ্বারা তারা প্রকৃত মানুষের মর্যাদা পেয়েছে; যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– ইসলাম গোলামকে অনর্থক শাস্তি দেয়া বা প্রহার করার কারণে শাস্তি নির্ধারণ করেছে-তাদেরকে আযাদ করে দেয়া। যাতে বাস্তবিক অর্থেই গোলামমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হয়। একবার হযরত ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু তার এক গোলামকে ডাকলেন। তার পিঠে

---

[১৩৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৩৯৬৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৩৬৫
[১৩৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং -২৪১৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২২৪৯
[১৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -১৬৬১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২১৫২১

আঘাতের দাগ দেখতে পেয়ে বললেন, তুতি কি এতে ব্যাথা অনুভব করছো? সে বললো- না। তখন তিনি গোলামকে বললেন- যাও তুমি আযাদ। এরপর তিনি এক টুকরা মাটি হাতে নিয়ে বললেন- তাকে আযাদ করে আমার এতটুকু পরিমাণ সওয়াবও মেলেনি। কেননা, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনেছি- "যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে নিজের গোলামকে শাস্তি দিলো বা প্রহার করলো, তার কাফফারা হলো- গোলামকে আযাদ করে দেয়া।"[১৩৭]

এমনকি ইসলম গোলাম আযাদকে এতোটা সহজ করে দিয়েছে যে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় গোলাম আযাদের শব্দ বলার দ্বারাই তারা সাথে সাথে আযাদ হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তিনটি বিষয় এমন আছে, যা ইচ্ছা করে বললেও প্রয়োগ হয়, আবার ঠাট্টা করে বললেও প্রয়োগ হয়। সেগুলো হলো- তালাক, বিবাহ আর গোলাম আযাদ।"[১৩৮]

অনুরূপভাবে ইসলাম গোলাম আযাদ করাকে গুনাহ মাফের উসিলা বানিয়েছে। যাতে এর মাধ্যমে একটি বৃহত্তম সংখ্যা গোলামী থেকে মুক্তি পায়। কেননা, প্রত্যেক বনী আদমই গুনাহ করে থাকে। আর গুনাহ তো অবশ্যই মাফ করাতে হয়। সুতরাং দেখা যাবে গুনাহ মাফের জন্য প্রত্যেকে গোলাম আযাদ করতে থাকলে একসময় সমাজ গোলামমুক্ত হয়ে যাবে। গোলামমুক্তির ফযিলত বর্ণনা করে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে আযাদ করলে সে তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হবে। আযাদকৃত ব্যক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ আযাদকারী ব্যক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। কোনো মুসলমান দু'জন মহিলাকে আযাদ করলে তারা উভয়ে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম হবে। আর তার প্রত্যেকটি অঙ্গের মুক্তির জন্য এদের উভয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যথেষ্ট হবে। কোনো মুসলমান মহিলা অপর মুসলমান মহিলাকে আযাদ করলে সে আযাদকারিণীর জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। তার প্রত্যেক অঙ্গের মুক্তির জন্য আযাদকৃত মহিলার প্রত্যেক অঙ্গই যথেষ্ট হবে।"[১৩৯]

---

[১৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -১৬৫৭ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৫১৬৮

[১৩৮] মুসনাদে হারেস, হাদীস নং-৫০৩

[১৩৯] জামে তিমিযী, হাদীস নং- ১৫৪৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৫০৯

ইসলাম গোলামদেরকে মুকাতাবার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করার সুযোগ দিয়েছে। আর মুকাতাবা হলো– "গোলাম তার মালিকের সাথে নির্ধারিত সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তি করা।" অর্থাৎ চুক্তিকৃত পরিমাণ সম্পদ যখন সে মালিককে দিতে পারবে, তখন সে আযাদ ।

এক্ষেত্রে ইসলাম মালিককে আদেশ দিয়েছে– "যদি কোনো গোলাম মুকাতাবার চুক্তি করে, তাহলে সে যেনো এ ব্যাপারে গোলামকে যাবতীয় সাহায্য করে। কেননা, মানুষ হিসেবে সে তো মৌলিকভাবে আযাদ। গোলাম তো পরে কোনো কারণবশত হয়েছে।" স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেসের মুকাতাবার টাকা নিজে আদায় করে দিয়ে তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। পরে আবার তাকে বিবাহও করেছিলেন। মুসলমানগণ যখন এই বিবাহের খবর শুনতে পেলো, তখন তারা তাদের কাছে থাকা গোলাম-বাঁদীদেরকেও আযাদ করে দিলো।

সাহাবায়ে কেরাম বলেন- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বিবাহের কারণে বনী মুসতালেকের একশত লোককে আযাদ করে দেয়া হয়।"[১৪০]

শুধু তাই নয়, ইসলাম গোলাম আযাদ করার জন্য যাকাতের টাকা ব্যয় করারও অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "নিশ্চয়ই সদকা (যাকাত) হচ্ছে গরীব-মিসকিনদের জন্য, এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করতে হয়, তাদের জন্য এবং গোলাম আযাদ করার জন্য।"[১৪১]

বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে ৬৩ জন ব্যক্তিকে আযাদ করেছিলেন। হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা করেছিলেন ৬৯ জন। হযরহ আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন অনেকজন। হযরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন ৭০ জন। হযরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন ২০ জন। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাজিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন ১০০ জন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু

[১৪০] সীরাতুন্নাবাবিয়্যাহ, ইবনে কাসীর:৩০৩/৩
[১৪১] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-৬০

করেছিলেন ১০০০ জন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন ৩০ হাজার জন।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা গোলাম ব্যবসা কমানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বরং তা পুরোপুরিভাবে বন্ধই করে দিয়েছে। এমনকি ইসলামী যুগের শেষের দিকে ইসলাম গোলামদেরকে গোলামীর শিকলমুক্ত করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদে আসীন করেছিলো। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো– ইসলামী ইতিহাসে মুসলমানদের বিরাট এক অংশে আযাদকৃত গোলামরা প্রায় তিনশত বছর শাসন করেছে। নি:সন্দেহে এটি বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল উদাহরণ।

ইসলামে মালিকানার স্বাধীনতা

কমিউনিজম ও পুঁজিবাদে মালিকানার স্বাধীনতাঃ

কোনো বস্তুর মালিকানা এবং সার্বিক অধিকারের বিষয়ে অতীত বিশ্ব ও বর্তমান বিশ্ব খুবই পেরেশান। আজ পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে মীমাংসিত ও সর্বসম্মত কোনো পথ ও পন্থা বের করতে পারেনি। ফলে তৈরি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আর নানান ধরণের মতামত।

এর মধ্যে একটি হলো– 'কমিউনিজম'। যা ব্যক্তির মূল্য এবং স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে দেয়। কারণ কমিউনিজমের মূল বক্তব্য হলো– "কোনো ব্যক্তি ভূমি, ফ্যাক্টরি, স্থাবর সম্পদ এবং উৎপাদনশীল কোনো বস্তুরই মালিক হতে পারবে না। বরং ব্যক্তির কাজ হলো, শ্রমিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাজ করা। রাষ্ট্রই সকল কিছুর মালিকানা এবং হস্তক্ষেপের পূর্ণ অধিকার রাখে। একজন শ্রমিকের জন্য পুঁজি সংরক্ষণ করা সম্পূর্ণ হারাম। যদিও তা বৈধ উপায়ে হয়।"

অনুরূপ আরেকটি মতবাদ হলো– 'পুঁজিবাদ'। যা একজন ব্যক্তির প্রতি সম্মান রেখে তাকে পূর্ণ মালিকানা এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। সে যা ইচ্ছা তা অর্জন করতে পারে। যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারে। মনমতো সম্পদ উপার্জন, সম্পদ বৃদ্ধি এবং সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে কারও কোনো বাধা নেই। এ ব্যাপারে সমাজেরও হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই। ফলে বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম কোনো কিছু চিন্তা না করেই যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সে সম্পদ উপার্জন করতে থাকে।

ইসলাম ও স্বাধীন মালিকানাঃ

ব্যক্তি মালিকানা বৃদ্ধির ব্যাপারে পুঁজিবাদের স্থূলনীতি; আর ব্যক্তি মালিকানা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কমিউনিজমের সংকোচননীতি– এ দুই মতবাদের সকল সুবিধা-অসুবিধা আর ভালো-মন্দের মাঝখানে হলো ইসলামের মধ্যমপন্থা। যা ব্যক্তি এবং সামষ্টিক মালিকানার সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে। কেননা, ইসলাম অন্যের অধিকার রক্ষা করে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতির ভিত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। সাথে সাথে অন্যের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ব্যক্তি মালিকানাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে।

আর সেটাকে সামষ্টিক মালিকানায় রূপান্তরিত করেছে। সুতরাং দেখা যায় ইসলাম ভারসাম্যতা আর পরিমিতিবোধ ঠিক রেখে ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতাকে যেমন নিশ্চিত করেছে; সামষ্টিক মালিকানার স্বাধীনতাকেও নিশ্চিত করেছে।

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানাঃ

ইসলাম নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনো বস্তুর মালিকানা লাভ করা এবং তা থেকে ফায়দা নেয়ার অধিকার একজন ব্যক্তিকে দিয়েছে। কেননা, এটা জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য; বরং তা মানবতার বৈশিষ্ট্য। সাথে সাথে এটা হলো উৎপাদনশীল সমাজ এবং উন্নত রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।

ইসলমী শরিয়ত এই অধিকারকে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বুনিয়াদ হিসেবে দাড় করেছে। এরপর এর ভিত্তিতে আরও অনেক আইন-কানুন ও বিধি-বিধান আরোপ করেছে। যেমনঃ মালিকের জন্য মাল হেফাজতের বিধান। চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীর জন্য জরিমানার বিধান। সাথে সাথে মালিকের অধিকার রক্ষা করা এবং অন্যের মালে অন্যায় হস্তক্ষেপ দূর করার জন্য তাদের কঠোর শাস্তির বিধান।

অনুরূপভাবে এই অধিকারের উপর ভিত্তি করে ইসলাম আরও কিছু বিধি-বিধান দিয়েছে। যেমন: নিজের মাল ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, বন্ধক, দান, ওসিয়ত ইত্যাদির মত বৈধ সকল লেনদেনে পূর্ণ স্বাধীনতা।

এতদ্বসত্ত্বেও ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে একেবারে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়নি; বরং এতটুকু শর্ত সাপেক্ষে দিয়েছে, যাতে কোনোভাবেই অন্যের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব না হয়। এজন্য ইসলামে সুদ, ঘুষ, ধোকা এবং মজুতদারি ইত্যাদি- যা সামষ্টিক কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক; সেগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে।

ব্যক্তি মালিকানার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা সবাই সমান। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন–

"পুরুষরা যা উপার্জন করবে তা তাদের, আর মহিলারা যা উপার্জন করবে তা তাদের।"[১৪২]

ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– যার কাছে সম্পদ আছে, সে এই সম্পদকে কাজে লাগাবে। কেননা, যদি সম্পদ কাজে না লাগায়, তাহলে এই সম্পদ দ্বারা মালিকের কোনো ফায়দা হয় না। সমাজও এর দ্বারা কোনো লাভবান হয় না।

সম্পদ কাজে লাগানোর পর যখন সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে নেসাব (যতটুকু হলে যাকাত ওয়াজিব হয়) পরিমাণ হবে এবং তা এক বছর অতিক্রান্ত হবে, তখন এই সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

ইসলামে সামষ্টিক মালিকানাঃ

ইসলামে সামষ্টিক মালিকানা এমন একটি বিষয়, মানব সমাজের বিরাট এক অংশ যার উপর অধিকার রাখে। আর সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য এর ফায়দা ব্যাপক হয়। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেই এর ফায়দা ভোগ করতে পারে। কারও একক কর্তৃত্ব এখানে চলে না। যেমনঃ মসজিদ, সরকারি হাসপাতাল, রাস্তা, নদ-নদী, সাগর ইত্যাদি। এগুলোর মালিকানা সামষ্টিক। সমাজের সবার কল্যাণেই এগুলো ব্যবহার হবে। সরকার বা সরকারি প্রতিনিধির একক অধিকার এসব ক্ষেত্রে চলবে না; বরং তারা এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল হিসেবে থাকতে পারে এবং এগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য এখান থেকে উপকৃত হতে পারে।

ব্যক্তি মালিকানার উৎসসমূহঃ

ব্যক্তি মালিকানা অর্জনের জন্য ইসলাম কিছু পথ ও পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ ছাড়া অন্য পন্থায় মালিকানা অর্জন করা বৈধ নয়। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা অর্জনের যেসব উৎস রয়েছে, সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম উৎসঃ নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ। অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানায় এমনভাবে আসে, শরিয়তসম্মত কোনো লেনদেন ছাড়া তা আর

---

[১৪২] সুরা নিসা, আয়াত নং-৩২

অন্য কারও মালিকানায় যায় না। যেমনঃ মিরাস, ওসিয়ত, শুফা, ক্রয়-বিক্রয়, দান, সদকা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উৎসঃ বৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ। অর্থাৎ যা পূর্বে কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকে না, বরং সে কোনো কাজের মাধ্যমে তার মালিকানা অর্জন করে এবং তা হস্তগত করে। যেমনঃ পতিত জমি চাষ করা, শিকার করা, জমিন থেকে কোনো গচ্ছিত সম্পদ পাওয়া এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোনো জায়গা পাওয়া ইত্যাদি।

সামষ্টিক মালিকানার উৎসসমূহঃ

ইসলামে সামষ্টিক মালিকানার কয়েকটি উৎস রয়েছে। এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম উৎসঃ সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ। রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ কোনো রকম কাজকর্ম না করেও এগুলো ভোগ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যেমন- পানি, ঘাস, আগুন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উৎসঃ সংরক্ষিত বিভিন্ন স্থান ও সম্পদ। রাষ্ট্র যেগুলোকে মুসলমান এবং জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে রাখে। যেমন- কবরস্থান, ওয়াকফকৃত জমি, যাকাত, সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি।

তৃতীয় উৎসঃ ঐ সকল জায়গা, যেগুলো কারও মালিকানাধীন না। দীর্ঘকাল যাবত এভাবেই পড়ে আছে। কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করেনি। যেমন- পতিত জমি।

সম্পদের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা সম্পদকে ঠিকমতো দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে অন্যের স্বাধীন মালিকানায় অন্যায় হস্তক্ষেপকারীর জন্য ইসলামী শরিয়ত বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও রেখেছে। যেমন- চোরের জন্য হাত কাটা।

অবৈধ মালিকানাঃ

মালিকানা অর্জন করতে হবে হালাল এবং বৈধ পন্থায়। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ নেয়া বৈধ নয়। সুতরাং এতিমদেরকে ধোকা দিয়ে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না। গরিবের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে তার সম্পদ নেয়া

যাবে না। অভাবীদের অভাব পূরণ করতে গিয়ে তার থেকে সুদ নেয়া যাবে না। জুয়া খেলা যাবে না। কেননা, এটা সমাজে মানুষের মাঝে শত্রুতা তৈরি করে এবং সমাজের ঐক্য নষ্ট করে পরস্পরের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ খেয়ো না। তবে পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।"[১৪৩]

যদি কেউ অবৈধ এবং নাজায়েয পন্থায় সম্পদ অর্জন করে, তাহলে ইসলাম তার এই সম্পদের স্বীকৃতি দেয় না এবং এই সম্পদ সংরক্ষণও করতে বলে না। বরং তাকে এই আদেশ করে যে, সে যেনো এই সম্পদ তার আসল মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়। যেমনঃ চুরিকৃত সম্পদ বা ছিনতাইকৃত সম্পদ। এগুলোর ক্ষেত্রে হুকুম হলো- এই সম্পদকে তার মালিকের নিকট পৌঁছে দিবে। যদি মালিক পাওয়া না যায়, তাহলে বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবে।

সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতি ও বৈধ লেনদেন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ পন্থাগুলো ছাড়া অন্য কোনো হারাম পন্থায় লেনদেন করে সম্পদ বৃদ্ধি করা ইসলাম একদম সমর্থন করে না। যেমনঃ সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করা, মদ বিক্রি করা, নেশাদ্রব্য বিক্রি করা, জুয়ার ক্লাব খোলা ইত্যাদি।

সাথে সাথে ইসলাম প্রত্যেককে ব্যক্তি মালিকানার নির্দিষ্ট একটা অংশ সমাজের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। যেমনঃ যাকাত, দান, সদকা এবং সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করা।

ওয়ারিসদের সম্পদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করতে নিষেধ করে দিয়েছে ইসলাম।

অনুরূপভাবে ইসলাম মানুষকে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। আর অপচয়-অপব্যয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।"[১৪৪]

---

[১৪৩] সুরা নিসা, আয়াত নং-২৯

[১৪৪] সুরা ফুরকান, আয়াদ নং-৬৭

তিনি আরও বলেন– "তোমরা খাও, পান করো তবে অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[১৪৫]

ইসলামী শরিয়ত যেসব বিষয়কে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে, সেসব ক্ষেত্রে টাকা ব্যয় করাকেও হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন হলে জনস্বার্থে নিজের সম্পদের অধিকার ছেড়ে দেয়াকে বৈধ করা হয়েছে। যদিও এতে মালিকের কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হয়। যেমনঃ জনসাধারণের চলাচলের জন্য নিজের জমি ছেড়ে দেয়া।

অমুসলিমদের মালিকানাঃ

এটা এমন এক অধিকার, যার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেক ব্যক্তিই এর ফায়দা ভোগ করে। তারা যত পারে ততো বেশি সম্পদ অর্জন করতে পারে। এর একটি বাস্তব নমুনা– "১০তম আব্বসী খলীফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলো এক খৃস্টান– জিব্রাইল ইবনে বখতিষো। খলীফা তাকে অনেক মুহাব্বত করতেন। সে পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন আর ধন-সম্পদে ছিলো খলীফার সমতূল্য।"[১৪৬]

সর্বসাধারণের জন্য যে ব্যয় বা বরাদ্দ দেয়া হয়, সেখান থেকেও অমুসলিমরা উপকৃত হয়।

এই হলো ইসলামে স্বাধীন মালিকানার অধিকার। যা মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-গরিব সবাইকেই দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত হলো– নিজের অধিকার আদায় করতে গিয়ে জনসাধারণের অধিকারে কোনো ক্ষতি করর্তে পারবে না। আর অন্য কোনো ব্যক্তির অধিকারেও বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

---

[১৪৫] সুরা আরাফ, আয়াত নং-৩১

[১৪৬] মিন রওয়াই' হাজারাতিনা:৬৮

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

ভূমিকাঃ

একেকটি মুসলিম পরিবার হলো মুসলিম সমাজের একেকটি ইটের মত। বরং তা সমাজের দূর্গ বা কেল্লা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মূলকেন্দ্র। ইসলাম পরিবার রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতিও দিয়েছে। সেখানে প্রত্যেকের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, মীরাস, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা, পিতা-মাতার অধিকার ইত্যাদি সবই বলে দেয়া হয়েছে ইসলামী আইনে। অনুরূপভাবে পরস্পরে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতা কেমন হওয়া উচিৎ তাও বলা হয়েছে।

কেননা, একটি পরিবার যখন শক্তিশালী হয় এবং এর প্রত্যেকটি সদস্য সঠিক পথে চলে, তখন একটি সমাজ শক্তিশালী হয় এবং তা সঠিক পথে চলতে থাকে। আর এভাবে প্রত্যেক সদস্যের মাঝে উন্নত মানবতা আর সামাজিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই ইসলাম আদর্শ ও উন্নত সমাজ গঠনে সক্ষম হয়, যার কোনো তুলনা হয় না। আর সমাজ মুক্তি পায় চারিত্রিক অধ:পতন এবং পরিবার ধ্বংসের অশুভ পরিণতি থেকে।

ইসলামী সভ্যতায় পরিবারের ভিত্তিঃ

ইসলামী সভ্যতায় একটি পরিবার গঠন হয় দু'টি মৌলিক স্তম্ভের উপর– পুরুষ এবং মহিলা। অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী। এদের মাধ্যমে একটি পরিবার গঠন হয়, মানবসন্তান জন্ম হয় এবং মানবজনমের ধারাবাহিকতা চালু থাকে। এখান থেকেই একসময় একটি জাতি ও সমাজ তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।"[১৪৭]

---

[১৪৭] সুরা নিসা, আয়াত নং-১

তিনি আরও বলেন– "আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র ও নাতী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন পবিত্র রিযিক।"[১৪৮]

এই দু'টি ভিত্তি মজবুত করার জন্য ইসলামও অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত বহু আইন-কানুন দিয়েছে ইসলাম। নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাদের পরস্পরের সীমারেখা। নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য। যাতে সুন্দর পরিবার গঠনে প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে। আর আদর্শ একটি মানব সমাজ গঠনে প্রত্যেকেই যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

ইসলামের নিয়ম হলো– আগে আগে বিবাহ করা। যাতে মানব সম্প্রদায় টিকে থাকে। সৎ লোক দ্বারা সমাজ গঠন সহজ হয়। প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজ থেকে দুশ্চরিত্র ও অনৈতিকতা দূর হয়ে যায়। আর তারা যাতে খেলাফতের চাহিদা পূরণ করে ইসলামী খেলাফতকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে পারে।

এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন– "হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবন গড়তে সক্ষম, সে যেনো বিবাহ করে। কারণ তা (বিবাহ) দৃষ্টিকে নিচু করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে। আর যে সক্ষম নয়, সে যেনো রোজা রাখে। কেননা, এটা তার জন্য যৌনকামনা দমনকারী।"[১৪৯]

এরপর কিছু যুবক যখন চিন্তা করলো, তারা বিবাহ করবে না; বরং পুরোটা জীবন আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে কাটিয়ে দিবে, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কঠিনভাবে এটা করতে নিষেধ করে দিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন– "একবার তিনজন ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের নিকট এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জানতে চাইলো। যখন তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদাত সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা এটাকে কম মনে করলো। আর বললো- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আমাদের তুলনা করলে চলবে না। কেননা, তার পূর্বাপর

[১৪৮] সুরাতু নাহল, আয়াত নং-৭২
[১৪৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৪৭৭৯ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪০০

সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বললো- আমি সারা জীবন রাতভর নামাজ পড়তে থাকবো। আরেকজন বললো- আমি সবসময় রোজা রাখতে থাকবো, কখনও ভাঙবো না। আরেকজন বললো- আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করবো, কখনও বিবাহ করবো না। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে বললেন- তোমরাই কি ঐসব লোক, যারা এমন এমন কথা বলেছো? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বেশি তার প্রতি অনুগত। অথচ আমি রোজা রাখি, আবার কখনও রাখি না। নফল নামাজ কখনও পড়ি, কখনও ঘুমাই। আবার আমি মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যারা আমার সুন্নতের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।"[১৫০]

আধুনিক যুগে বৈরাগ্যবাদঃ

যারা বিবাহকে ভয় পেত এবং মানুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করতো, কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর এখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এমনকি আধুনিক ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবিরা যখন দেখতে পেলো– বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে সমাজে শুধু অনৈতিকতা আর অনিষ্টতাই ছড়াচ্ছে। ভালো কিছু হচ্ছে না। তখন ১৫ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার পর এসে অশান্তি আর অনৈতিকতা থেকে মুক্তির জন্য এখন বৈরাগ্যবাদকে তারাও নিষেধ করছে। কেননা, বৈরাগী পুরোহিত ও পাদ্রীদের দ্বারা শিশুরা প্রচুর পরিমাণে ধর্ষিত হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও বিষয়টা ব্যাপকাকার ধারণ করেছে। এমনকি এই অপরাধে শতশত পুরোহিত ও পাদ্রী পদত্যাগ পর্যন্ত করেছে। এই যৌনবিচ্যুতি এবং নৈতিক পদস্খলনের ভয়াবহতায় গির্জাগুলি বিচলিত ও আতংকিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের পবিত্র ধর্ম আমাদেরকে এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছে। আমাদেরকে দু:খজনক অভিজ্ঞতা আর তিক্ত ব্যাথা থেকে মুক্তি দিয়েছে।[১৫১]

---

[১৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৪৭৭৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪০১
[১৫১] হুকুকুল ইনসান ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ:১৩৪

বিবাহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ

ইসলামে বিবাহের উদ্দেশ্য হলো, নিজের ভেতরে থাকা সুপ্ত আবেগ-অনুভূতিকে যথাস্থানে কাজে লাগানোর মাধ্যমে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করা। বিবাহ হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যেখানে একজন অপরজনের কাছে সপে দেয়। একাকিত্বের মুহূর্তে হয় একে অপরের একদম ঘনিষ্ঠ-অন্তরঙ্গ। আর দূর থেকে হয় একে অপরের কল্যাণকামী বন্ধু। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তার অন্যতম একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মাঝে দিয়েছেন ভালোবাসা ও দয়া।"[১৫২]

উক্ত আয়াতে বর্ণিত এই তিনটি বিষয় তথা– প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়ার মাধ্যমেই বৈবাহিক সুখ-শান্তি অর্জিত হয়, যা ইসলামে বিবাহের উদ্দেশ্য।

ইসলামে দম্পতি নির্বাচনের মানদণ্ডঃ

ইসলাম ছেলেমেয়ে উভয়কে এই এখতিয়ার দিয়েছে যে, তারা উভয়ে উভয়ের জন্য নিজেদের পছন্দমত সঙ্গী বেছে নিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তোমরা তোমাদের অবিবাহিত নারী-পুরুষ এবং সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও।"[১৫৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেদেরকে পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন– "বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েদের চারটি জিনিস লক্ষ্য করা হয়। তাদের ধন-সম্পদ, বংশীয় আভিজাত্য, রূপ-গুন ও দ্বীনদারি। যদি তুমি দ্বীনদার মেয়ে পেয়ে যাও, তাহলে তাকেই প্রাধান্য দাও। যদি এটা না করো, তাহলে তুমি হতভাগা।"[১৫৪]

অনুরূপভাবে তিনি মেয়েদেরকে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারি এবং আখলাককে প্রাধান্য দিয়ে বলেন– "তোমরা যে ব্যক্তির দ্বীনদারি এবং নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছো, সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে তার কাছে বিয়ে দিয়ে

---

[১৫২] সুরা রুম, আয়াত নং-২১
[১৫৩] সুরা নুর, আয়াত নং-৩২
[১৫৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৪৮০২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৪৬৬

দাও। যদি এমন না করো, তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"[১৫৫]

নি:সন্দেহে ছেলেমেয়ের এই অধিকারটা সমাজে অনেক কল্যাণ বয়ে আনে। কেননা, এই নেককার স্বামী-স্ত্রী থেকেই তো নেককার ছেলেমেয়েদের বংশ বিস্তার হবে। যারা পারিবারিকভাবে পরস্পরে ভালোবাসা ও মুহাব্বতের সাথে থাকবে। আর সমাজে ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ঠিক রেখে চলবে।

ইসলামী শরিয়তে বৈবাহিক সম্পর্কঃ

ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক। এই সম্পর্কের আগে কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। যা এই সম্পর্কের পথকে সুগম করে এবং সম্পর্ককে স্থায়ী ও চিরস্থায়ী করে। ইসলাম এই সম্পর্কের ভূমিকাকেই যে গুরুত্ব দিয়েছে, অন্যকোনো সম্পর্ককেও এতোটা গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি এর জন্য বিশেষ কিছু বিধানও দিয়েছে ইসলাম।

বৈবাহিক সম্পর্কের ভূমিকা হলো– বিয়ের প্রস্তাব দেয়া। এটা একে অপরকে চেনা এবং জানার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে ছেলেমেয়ে উভয় পক্ষই একে অপরকে ভালোভাবে বুঝার অনুমতি দিয়ে থাকে। আর এই চেনা-জানার ভিত্তিতেই দুই পক্ষ এই বৈবাহিক সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া বা এখান থেকে সরে আসার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অনুরূপভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক গ্রহণীয় হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো– অবশ্যই তা প্রচার করা। এর রহস্য হলো– ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর মাধ্যমে দ্বীনি ও দুনিয়াবি অনেক কল্যাণ লাভ হয়। সুতরাং এটা প্রকাশ্যে এবং সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই করা উচিৎ। যাতে কারও মনে কোনো খারাপ ধারণা এবং সন্দেহ না থাকে।

ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্ককে একটি মজবুত রশি দিয়ে বেঁধেছে। যাতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সুখে থাকে। আর দুই পরিবারের মাঝে শান্তি বজায় থাকে। এজন্য ইসলাম সর্বক্ষেত্রে স্বামীদেরকে স্ত্রীদের অভিভাবক বানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদের

---

[১৫৫] জামে তিমিযী, হাদীস নং- ১০০১ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৯৬৭

একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে।"[১৫৬]

এই অভিভাবকত্বের কারণেই ইসলাম স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব করেছে। আর এটাকে বানিয়েছে স্ত্রীর অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মহর দিয়ে দাও।"[১৫৭]

স্ত্রীদের আরেকটি অধিকার হলো– তাদের ভরণপোষণ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাবার, কাপড়, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। সাথে সাথে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কারা। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তোমরা তাদের সাথে সৎ ভাবে বসবাস করো। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[১৫৮]

পক্ষান্তরে ইসলাম স্বামীদেরকেও কিছু অধিকার দিয়েছে স্ত্রীদের উপর। তা হলো– স্বামীর আনুগত্য করা। বৈবাহিক জীবনে এটা হলো স্বামীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই কিছু অধিকার এবং দায়িত্ব দিয়েছে। যার যার দায়িত্ব সে সে পালন করবে। ইসলাম তাদের থেকে এটাই কামনা করে যে– তারা পরস্পরে ভদ্র ও সংযত আচরণ করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়তা করবে।

যদি কখনও তাদের মাঝে মতবিরোধ, ঝগড়া বা কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলাম তা নিরসনের বিভিন্ন পথ ও পন্থা বলে দিয়েছে। যদি তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তারা আর কিছুতেই আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা রক্ষা করতে পারছে না; আর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাদের একত্রে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, তখন ইসলাম তাদেরকে সর্বশেষ চিকিৎসা হিসেবে তালাক বা বিচ্ছেদের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। যাতে তারা একে অপর থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যেতে পারে।

---

[১৫৬] সুরা নিসা, আয়াত নং-৩৪

[১৫৭] সুরা নিসা, আয়াত নং-৪

[১৫৮] সুরা নিসা, আয়াত নং-১৯

ইসলামে সন্তানের অধিকার ও কর্তব্য

শিশুর জীবনে পরিবেশের প্রভাবঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুরা হলো জীবনের ফুল এবং সৌন্দর্য। তারা হৃদয়ের প্রফুল্লতা আর চোখের শীতলতা। এজন্য ইসলাম শিশুদের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলামী শরিয়ত পিতা-মাতার উপর শিশুদের অনেক অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। একজন শিশু সর্বপ্রথম তার পিতা-মাতার পরিবেশ দ্বারাই প্রভাবিত হয়। যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "প্রতিটি শিশু স্বভাবজাতভাবে ইসলাম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায় বা খৃস্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজারী বানায়।"[১৫৯]

একটি শিশুর দ্বীন-ধর্ম এবং চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার বিরাট ভূমিকা থাকে। এজন্য যদি পিতা-মাতা সৎ আদর্শবান ও ভালো হয়, তাহলে তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ভালো হওয়ার আশা করা যায়। এজন্য জন্মের পূর্বেই সন্তানের কিছু অধিকার আদায় করতে হয়। যা শুধু আদর্শ পিতা-মাতারাই করে থাকেন।

জন্মপূর্ব সন্তানের কিছু অধিকারঃ

শয়তান থেকে তাকে রক্ষা করাঃ-

স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরে মিলিত হয় , তখন এর সাথে সন্তানেরও একটি অধিকার সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তা হলো– বাবার পিঠ থেকে মায়ের রেহেমে যাওয়ার সময় সন্তানকে শয়তানের স্পর্শমুক্ত রাখা। এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন পিতা-মাতা উভয়ে সুন্নত তরীকায় মিলিত হবে আর শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার ঐ দুআ পড়বে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল

---

[১৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬২২৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬৯২৬

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমাদেন মধ্যে যখন কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, তখন যদি এই দুআ পড়ে– بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا– (বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশাইত্বানি ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রযাকতানা) অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন। আর আমাদেরকে আপনি যা দান করবেন, তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখুন। তাহলে এই মিলনে যদি তাদের সন্তান হয়, তো এই সন্তানকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[১৬০]

শিশুর জীবনের অধিকার:-

মাতৃগর্ভে যখন শিশুর ভ্রূণ তৈরি হয়, তখনই ইসলাম তাকে জীবনের অধিকার প্রদান করে। এ অবস্থায় ইসলামী শরিয়ত মায়ের জন্য গর্ভপাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা, এটা এমন এক আমানত, যা আল্লাহ তাআলা মায়ের গর্ভে রেখেছেন। আর এ ভ্রূণের জন্য জীবনের অধিকার দিয়েছেন। এজন্য ভ্রূণের কোনো ক্ষতি করা বা নষ্ট করা জায়েয নেই।

এরপর যখন এই ভ্রূণটির চার মাস হয়ে যায়, আর তার মধ্যে রূহ চলে আসে, তখন ইসলামী শরিয়ত তাকে একটি জীবন্ত মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। এ অবস্থায় তাকে হত্যা করা কিছুতেই জায়েয হয় না। যদি কেউ হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর উপর দিয়ত তথা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে যায়।

হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "এক মহিলা তার সতীনকে কুড়ে ঘরের খুঁটি দ্বারা আঘাত করে মেরে ফেললো। ঐ মহিলার পেটে বাচ্চা ছিলো, সে বাচ্চাটিও মারা গেলো। পরে নিহত মহিলার পরিবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে এর বিচার চাইলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী মহিলার ওয়ারিসদেরকে নিহত মহিলার হত্যার দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) প্রদানের নির্দেশ দিলেন। আর গর্ভে নিহত সন্তানের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি গোলাম প্রদানের হুকুম দিলেন। তখন হত্যাকারী মহিলার পরিবারের এক ব্যক্তি বললো- আমরা এমন শিশুর ক্ষতিপূরণ দিবো, যে খায়নি, পান করেনি এবং কোনো শব্দও করেনি! সে তো এলো আর গেলো শুধু। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

[১৬০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং -৪৭৬৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৯১

সে যেনো বেদুঈনের মত ছন্দযুক্ত বাক্যে কথা বললো! বর্ণনাকারী বলেন- এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী মহিলার পরিবারের উপর দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) আদায়ের নির্দেশ দিলেন।"[১৬১]

এমনকি ইসলামী শরিয়ত গর্ভবতী মহিলাকে রমজানের রোজা ভাঙারও অনুমতি দিয়েছে– যাতে গর্ভস্থ সন্তানের কোনো রকম ক্ষতি না হয়।

যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা ব্যভিচার করে, তাহলে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে দুধ ছাড়া পর্যন্ত শাস্তি বিলম্ব করারও অনুমতি দিয়েছে ইসলাম– যাতে সন্তানটা বেঁচে যায়।

জন্মের পর সন্তানের কিছু অধিকারঃ

সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর কী কী করতে হবে, এ বিষয়েও ইসলাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

সন্তান জন্মের সংবাদে খুশি হওয়া:-

গ্রহণ করার সময় আনন্দিত হওয়া মুস্তাহাব। পবিত্র কুরআনে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের ছেলে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন– "সে (হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম) যখন মেহরাবে দাড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলো, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললো- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইয়াহইয়া এর (জন্মের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। যে হবে আল্লাহর বাণী সত্যায়নকারী, নেতা, নারী সম্ভোগমুক্ত এবং একজন নেককার নবী।"[১৬২]

ছেলেমেয়ে সবার জন্মেই আনন্দিত হওয়া মুস্তাহাব। দু'জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

সন্তানের দুই কানে আযান-ইকামাত দেয়া:-

সন্তান জন্মের পর সাথে সাথে তার ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামাত দেয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ইবনে আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর

---

[১৬১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫৪২৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৮২

[১৬২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৩৯

জন্মের পর তার কানে আযান দিয়েছিলেন। হযরত আবু রাফে' রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- "হযরত ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু আনহা যখন হাসান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে প্রসব করলেন, তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার কানে নামাজের আযানের মত আযান দিতে দেখেছি।"[১৬৩]

খেজুর দ্বারা তাহনীক[১৬৪] করাঃ-

সন্তানের একটি অধিকার হলো- জন্মের পর তাদেরকে খেজুর দ্বারা তাহনীক করা। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহনীক করেছেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "আমার একটি ছেলে জন্ম নিলে তাকে নিয়ে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তিনি আমার ছেলের নাম রাখলেন ইব্রাহীম। এরপর তাকে খেজুর দ্বারা তাহনীক করালেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করলেন। পরে আমার কাছে দিয়ে দিলেন।"[১৬৫]

সন্তানের মাথার চুল ফেলে তার ওজন বরাবর সদকা করাঃ-

সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো– তার মাথার সমস্ত চুল ফেলে তার ওজন বরাবর রূপা সদকা করা। এতে সন্তানের শরীরিক উপকার লাভ হয়। সাথে সাথে সমাজেরও হয় কল্যাণ। শারীরিক উপকার হলো- চুলের ছিদ্রগুলো খুলে যায়। ময়লা দূর হয়। দুর্বল চুলগুলো দূর হয়ে যায়; আর তার স্থলে শক্ত চুল গজায়।

আর সামাজিক কল্যাণ হলো– তার চুলের ওজন বরাবর যে সদকা করা হয়, তার মাধ্যমে সমাজের অনেক লোকের সহায়তা হয়। গরীবের অন্তর খুশি হয়। এক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু

---

[১৬৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৫১০৭

[১৬৪] খেজুর দ্বারা তাহনীক করার অর্থ হলো– খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। শিশুদের খেজুর দ্বারা তাহনীক করার পেছনে একটি অন্যতম তাৎপর্য হলো– চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত শিশুর জন্মের পরপরই তাদের গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। কেননা, তাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকে। আর খেজুরে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ থাকে। তাই শিশুকে যদি খেজুর চিবিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এটা তার গ্লুকোজের ঘাটতি পূরণ করে। সুতরাং খেজুর দ্বারা তাহনীক হলো, শিশুদের জন্য একটি প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা।

[১৬৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং -৫০৪৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৯৯৭

বলেন– "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ে ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু আনহা হযরত হাসান ও হুসাইনের চুল ওজন করে তার ওজন বরাবর রূপা সদকা করেছেন।"[১৬৬]

সুন্দর নাম রাখাঃ-

সন্তান জন্মের পর তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার হলো– তার সুন্দর একটি নাম। সুতরাং পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, তাদের সন্তানের জন্য এমন একটি সুন্দর নাম রাখা, যে নামে তাকে সবাই চিনবে। আর সে নিজেও উক্ত নামে আনন্দবোধ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুন্দর নাম পছন্দ করতেন না। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো- আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। সবচেয়ে বিশ্বস্ত নাম হলো- হারিস ও হাম্মাম। আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম হলো- হারব ও মুররাহ।"[১৬৭]

হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "আমার ছেলে হাসান জন্মগ্রহণ করার পর আমি তার নাম রাখলাম- হারব। এরপর তাকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি বললেন– আমার সন্তানকে দেখাও; আর তার নাম কী রেখেছো? আমি বললাম- হারব। তিনি বললেন- না, তার নাম হাসান।

এরপর হুসাইন জন্মগ্রহণ করার পর আমি তার নাম রাখলাম- হারব। পরে তাকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি বললেন– আমার সন্তানকে দেখাও; আর তার নাম কী রেখেছো? আমি বললাম- হারব। তিনি বললেন- না, তার নাম হুসাইন।

এরপর যখন আমার তৃতীয় ছেলে জন্মগ্রহণ করলো, আমি তার নাম রাখলাম- হারব। পরে তাকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি বললেন– আমার সন্তানকে দেখাও; আর তার নাম কী রেখেছো? আমি বললাম- হারব। তিনি বললেন- না, তার নাম মুহসিন।

---

[১৬৬] মুআত্তা মালেক, হাদীস নং-১৮৪০

[১৬৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৪৯৫০ সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং-৩৫৬৮

এরপর তিনি বললেন- আমি হযরত হারুন আলাইহিস সালামের ছেলেদের নামের মত তাদের নাম রাখলাম। হযরত হারুন আলাইহিস সালামের ছেলেদের নাম ছিলো- শাকির, শারিব ও মুবাশশির।"[১৬৮]

সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা করাঃ-

সন্তান জন্মের পর তার আরেকটি অধিকার হলো- তার পক্ষ থেকে আকীকা করা। অর্থাৎ সন্তান জন্মের সাতদিন পর তার পক্ষ থেকে বকরি জবাই করা। এটা মূলত একদিকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ অপরদিকে সন্তান জন্মের উপর খুশি ও আনন্দ প্রকাশ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- "আল্লাহ তাআলা কষ্ট পছন্দ করেন না। যে ব্যক্তির ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেনো তার ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি বকরি জবাই করে। আর যে ব্যক্তির মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেনো তার মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি জবাই করে দেয়।"[১৬৯]

সন্তানকে দুধ পান করানোঃ-

সন্তান জন্মের পর তার আরেকটি অধিকার হলো- দুধ পান করানো। বুকের দুধ একটি শিশুর শারীরিক প্রবৃদ্ধি, মেধাশক্তির বিকাশ, সতেজ আবেগ-অনুভূতি আর উন্নত সমাজ গঠনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এজন্য ইসলামী শরিয়তের নিয়ম হলো- একজন মা পূর্ণ দুই বছর তার সন্তানকে দুধ পান করাবে। এটা একটি সন্তানের অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন- "আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যে তার সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য হলো- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মা'দেরকে খাবার ও পোষাক প্রদান করা।"[১৭০]

আধুনিক স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে- একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য দুই বছর সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইদানিং আধুনিক বিজ্ঞানী ও গবেষকদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিম জাতির উপর আল্লাহ তাআলা কত বড় অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন। অথচ এই দয়া ও অনুগ্রহ তো চলে আসছে সেই অনেক আগে থেকেই।

---

[১৬৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৭৬৯ সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৬৯৫৮

[১৬৯] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৮৪৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৮২২

[১৭০] সুরা বাকারাহ, আয়াত নং-২৩৩

ইসলামী শরিয়ত সন্তানের দুধ পান করানোর সময়কালকে অনেক গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে। আর দুধ পান করাকে সন্তানের অধিকার সাব্যস্ত করেছে। সন্তানের এই অধিকারটা শুধু তার মায়ের উপরই চাপিয়ে দেয়নি; বরং একটা দায়িত্ব তার বাবার কাধেও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তা হলো- মা'র খাবার এবং পোষাকের ব্যবস্থা করা। যাতে তার সন্তানের ভালোভাবে যত্ন নিতে পারে এবং দুধ পান করাতে পারে।

এভাবে ইসলামী শরিয়ত পিতা-মাতা উভয়কেই ভারসাম্যপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করেছে। যাতে শিশুটির সার্বিক যত্ন নেয়ার মাধ্যমে তার কল্যাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়। আর তারা উভয়েই যাতে যার যার সাধ্যমত চেষ্টা ও মেহনত দ্বারা এ দায়িত্বটি পালন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেয়া হয় না।"[১৭১]

সন্তানের লালন-পালন ও ভরণপোষণ:-

পিতা-মাতার উপর সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো– সন্তানকে ভালোভাবে লালন-পালন করা এবং তাদের উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা। ইসলামী শরিয়ত পিতা-মাতার উপর এটা ওয়াজিব করে দিয়েছে যে, তারা সন্তানের সুন্দর জীবন, সুস্থ দেহ, আর উত্তম খাবার দাবারের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগনের শাসক তাদের দায়িত্বশীল; সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘর এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল; সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর গোলাম তার মুনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৭২]

আদর্শ শিক্ষা দেয়া:-

সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো– তাদেরকে উত্তম আদর্শ এবং প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা দেয়া। সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "সাত বছর বয়সে তোমরা সন্তানদেরকে নামাজের আদেশ করো। দশ বছর বয়সে এসেও যদি নামাজ না

---

[১৭১] সুরা বাকারাহ, আয়াত নং-২৩৩
[১৭২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৪১৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮২৯

পড়ে, তাহলে তাদেরকে হালকা প্রহার করো। আর এ বয়সে ছেলেমেয়ের বিছানা আলাদা করে দাও।"[১৭৩]

আল্লাহ তাআলা যেমন আমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে বলেছেন, সাথে সাথে আমাদের সন্তানদেরকেও বাঁচাতে বলেছেন। তিনি বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর।"[১৭৪]

তাদেরকে স্নেহ-মমতায় লালন-পালন করা:-

সন্তানদেরকে যত্ন করে লালন-পালনের পাশাপাশি তাদেরকে আদর-সোহাগ করতে হবে। স্নেহ-মমতায় জড়িয়ে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে তাদের সাথে তাদের মত করে দুষ্টুমি, হাসি, মজা আর খেলাধুলাও করতে হবে। যাতে তাদের মন হাসিখুশি আর প্রফুল্ল থাকে। "একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান রাজিয়াল্লাহু আনহুকে চুমু খেলেন। হযরত আকরা' ইবনে হাবেস রাজিয়াল্লাহু আনহু এটা দেখে বললেন- আমার দশজন সন্তান আছে। কিন্তু আমি কখনই তাদের কাউকে এভাবে চুমু খাইনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন- যে দয়া করে না; তাকেও দয়া করা হয় না।"[১৭৫]

হযরত শাদ্দাদ ইবনে হাদ্দাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এশার নামাজের সময় আমাদের নিকট আসলেন। তখন তার কাধে ছিলো হযরত হাসান রাজিয়াল্লাহু আনহু বা হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু সামনে এসে তাকে নিচে নামিয়ে রাখলেন। এরপর নামাজের তাকবীর বলে দাড়িয়ে গেলেন। নামাজ আদায় করলেন। নামাজেন মধ্যে একটি সিজদা অনেক লম্বা করলেন। (শাদ্দাদ বলেন) আমার পিতা বলেন, তখন আমি আমার মাথা উঠালাম আর দেখলাম, ঐ ছেলেটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিঠে উঠে আছে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাতেই আছেন। এরপর আবার আমি আমার

---

[১৭৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৪৯৫ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৬৮৯
[১৭৪] সুরা তাহরীম, আয়াত নং-৬
[১৭৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬৫১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩১৮

সিজদায় গেলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করার পর লোকেরা বললো- হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আজকে নামাজের মধ্যে একটি সিজদা অনেক লম্বা করেছেন। ফলে আমরা মনে করেছি- আপনার কিছু হয়ে গেছে অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আসলে এগুলোর কোনোটাই আমার হয়নি। বরং আমার এ সন্তান আমাকে সওয়ারি বানিয়েছিলো। এজন্য তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়াটা আমার ভালো লাগেনি। যাতে সে তার কাজ শেষ করতে পারে।"[১৭৬]

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "আমি নামাজ শুরু করে দীর্ঘক্ষণ নামাজ পড়ার ইচ্ছা করি, কিন্তু শিশুদের কান্না আর তাদের মায়েদের বিচলিত হওয়ার কারণে নামাজকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।"[১৭৭]

মেয়েদেরকে আদর্শ শিক্ষা দেয়াঃ-

মেয়েদেরকে আদর্শ শিক্ষা দেয়া এবং তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা মেয়েদেরকে আদর্শ শিক্ষা দেয় এবং তাদেরকে বিশেষ গুণে গুণান্বিতা করে, তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন– "যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত উত্তরূপে প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকবো। এটা বলে তিনি তার হাতের আঙুলগুলোকে মিলিয়ে ফেললেন।"[১৭৮]

এভাবে ইসলাম পিতা-মাতার উপর সন্তানদের এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধিকার দিয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোনো মানবরচিত আইন-কানুন আর সংবিধান দিতে পারেনি। ইসলাম সন্তানের জীবনের প্রতিটি ধাপেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। একটি সন্তানের ভ্রূণ, দুগ্ধকাল, শৈশবকাল, কৈশরকাল এমনকি যৌবনকাল পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে ধাপেই রয়েছে ইসলামের ভিন্ন ভিন্ন দিকনির্দেশনা। শুধু তাই না, ভ্রূণ তৈরি হওয়ারও আগে থেকেই ইসলাম সন্তানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পিতা-মাতাকে উত্তম তরীকায় মেলামেশার প্রতি উৎসাহ প্রদান

---

[১৭৬] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং- -১১৪১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৭৬৮৮
[১৭৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৬৭৭ সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৯৮৯
[১৭৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -২৬৩১ আল আদাবুল মুফরাদ:৮৯৪

করেছে। যাতে শয়তান শুরু থেকেই তাকে কোনো ধরণের স্পর্শ করতে না পারে।

সন্তানের এসব অধিকারের প্রতি ইসলামের এতো গুরুত্ব দেয়ার মূল কারণ হলো, যাতে সমাজের প্রত্যেকটি নারী-পুরুষ উত্তম আদর্শ ও নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আর তাদের মাধ্যমে একটি সম্ভ্রান্ত ও সভ্য সমাজ তৈরি হয়।

ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার

ভূমিকাঃ

এখানে পিতা-মাতা বলতে ঐ দুইজন স্বামী-স্ত্রী, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সন্তান-সন্ততি দান করেন। এরপর তারা ভালোভাবে এই সন্তানদের যত্ন নেন। তাদের আরামের প্রতি খেয়াল রাখেন। তাদের অধিকারগুলো আদায় করেন। আর তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। যা পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকারঃ

ইসলাম সন্তানদের উপর পিতা-মাতার এই অধিকার ওয়াজিব করেছে যে, সন্তানরা পিতা-মাতার ভালো কাজের স্বীকৃতি দিবে। তাদের মন্দকাজে ভদ্রভাবে বাধা দিবে। তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করবে। তাদেরকে সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। বিশেষ করে যখন তারা বৃদ্ধ বয়সে চলে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তাদের সাথে ইহসান, অনুগ্রহ আর সদ্ব্যবহার করার প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেমনভাবে ছোটবেলায় পিতা-মাতা সন্তানের উপর অনুগ্রহ করেছে।

আল্লাহ তাআলার পর একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার ও দয়া পাওয়ার উপযুক্ত হলো তার পিতা এবং মাতা। এজন্য আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করাকে তার নিজের ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন– "আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মান দিয়ে কথা বলো। তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও। আর বলো– হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন। যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছে।"[১৭৯]

---

[১৭৯] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত নং-২৪-২৩

এখানে সন্তানদেরকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ আর অসদ্ব্যবহারে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি তাদের প্রতি সামান্য বিরক্তি ভাব নিয়ে 'উহ' বলে তাদের অনুভূতিতে আঘাত করাও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার প্রতি বিনয়ের যে পরিমাণ প্রশংসা করেছেন, তা অন্য কারও বিনয়ের ক্ষেত্রে করেননি। এমনকি তিনি অন্য কারও প্রতি এতো চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ের কথাও বলেননি। যেমনটি তিনি উক্ত আয়াতের শেষের দিকে বলেছেন– "তাদের উভয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ের ডানা নত করে দাও।"

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায়, তখন তাদের সাথে আরও বেশি সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। কেননা, এ অবস্থায় তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কখনও কখনও একদম অক্ষম হয়ে পড়ে।

এজন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেনো তাদের সাথে ভালো কথা বলি। তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলি। তাদেরকে মুহাব্বত করি। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদের জন্য রহমতের দুআ করি। যেমনিভাবে আমাদের ছোট বেলায় অসহায় অবস্থায় তারা আমাদের প্রতি রহম করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বেশি বেশি পিতা-মাতার প্রশংসা করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা নিজের প্রশংসার সাথে পিতা-মাতার প্রশংসাকে জুড়ে দিয়ে বলেন– "আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে। সুতারং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো। সবশেষে ফিরে আসতে হবে আমার কাছেই।"[১৮০]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হলো একটি অন্যতম সর্বোত্তম নেক আমল। এক্ষেত্রে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– "একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন– আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সময়মত নামাজ পড়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- এরপর কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

[১৮০] সুরা লুকমান, আয়াত নং-১৪

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- এরপর কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"[১৮১]

হযরত আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো- আমি আল্লাহ তাআলার নিকট পুরস্কার ও বিনিময়ের আশায় আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের বাইআত হতে চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমার পিতা-মাতা কেউ কি জীবিত আছে? সে বললো- হ্যাঁ, দু'জনই জীবিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সত্যিই কি তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদানের আশা করো? সে বললো- হ্যাঁ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"[১৮২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- তাহলে তাদের খেদমতের মাধ্যমে জিহাদ (এর সওয়াব অর্জন) করো।[১৮৩]

ইসলামী শরিয়ত সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী অধিকার দিয়েছে, আর কতটুকু অধিকার দিয়েছে, এটা বুঝা যায় হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে। তিনি বর্ণনা করেন– "এক ব্যক্তি এসে বললো- হে আল্লাহর রাসুল! আমার মালও আছে, সন্তানও আছে। কিন্তু আমার পিতা আমার কাছে আমার মাল চায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি এবং তোমার মাল, সবই তো তোমার পিতার।"[১৮৪]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত হাতেম ইবনে হিব্বান রহঃ বলেন– "এই ব্যক্তি তার পিতার সাথে অপরিচিতের মত ব্যবহার করতো। পিতার সাথে তার সম্পর্ক বেশি ভালো ছিলো না। তাই তাকে ধমকস্বরূপ এটা বলা হয়েছে। আর সে যেনো কথায়-কাজে সর্বদা তার পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে নিজের ধন-সম্পদ সবকিছু দিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করে ও তার

---

[১৮১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬২৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৩৭
[১৮২] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৫২৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৪৯০
[১৮৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৮৪২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৪৯
[১৮৪] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- -২২৯১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৯০২

প্রতি অনুগ্রহ করে– এই আদেশ দিয়েই মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'তুমি এবং তোমার মাল সবই তোমার পিতার।' এর অর্থ এই নয় যে, পিতা তার সন্তানের মালের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে। মন চাইলেই তার সন্তানের মাল ছিনিয়ে নিয়ে সে মালের মালিক হয়ে যাবে।"[১৮৫]

অসংখ্য হাদীস এবং আসারে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের আদেশ করা হয়েছে। আর অসদ্ব্যবহারে নিষেধ ও সতর্ক করা হয়েছে। কারণ ইসলামী শরিয়ত সমাজ থেকে সকল পঙ্কিলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করে মূল্যবোধসম্পন্ন একটি আদর্শ সমাজ গঠনের পথ প্রদর্শন করে।

---

[১৮৫] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-১৪২/২

ইসলামে আত্মীয়তার গুরুত্ব ও অধিকার

ভূমিকাঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পরিবার শুধু পিতা-মাতা আর সন্তান-সন্ততির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। বরং ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা এবং চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাইবোন সবাই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। তাদের সবার সাথেই সদ্ব্যবহার এবং সম্পর্ক বজায় রাখার জোর নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। আত্মীয়তা রক্ষা করা এক মহৎ গুণ। এটা রক্ষা করলে অনেক সওয়াব। আর ছিন্ন করলে রয়েছে তার জন্য কঠিন শাস্তি। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

আত্মীয়তা নামক এই বিশাল পরিবারের স্থায়ী সম্পর্ককে মজবুত রাখার জন্য ইসলাম অনেক হুকুম-আহকাম এবং নীতিমালা প্রদান করেছে। যেমন: পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখা। সবার প্রতি সবার খেয়াল রাখা। খোজ-খবর নেয়া। একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসা। অনুরূপভাবে ইসলাম দিয়েছে আত্মীয়দের উপর খরচ করার বিধান। তাদের মাঝে সম্পদ বন্টনের বিধান। আকেলার বিধান। অর্থাৎ যদি কেউ ভুলক্রমে অথবা অসতর্কতাবশত কাউকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এই হত্যাকারীর পরিবার এবং তার আত্মীয়স্বজন মিলে এ হত্যার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্কঃ

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হলো– তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। তাদের উপকার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তাদের কোনো ক্ষতি না করা। তাদের দেখাশোনা করা। খোঁজখবর নেয়া। সময় করে তাদেরকে দেখতে যাওয়া। কিছু হাদিয়া-তোহফা দেয়া। গরীব আত্মীয়দেরকে বেশিবেশি দান করা। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া। দাওয়াত দিলে কবুল করা। মাঝেমাঝে তাদেরকে দাওয়াত করা। তাদেরকে সম্মান করা। তাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করা। তাদের খুশিতে নিজেরাও খুশি হওয়া। আর তাদের দুখে দুখী হয়ে তাদেরকে শান্ত্বনা দেয়া। মোটকথা, সার্বিকভাবে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা এবং খোঁজখবর নেয়া।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা হলো– ইসলামী সমাজের ঐক্য ও সংহতি ঠিক রাখার এক অন্যতম মাধ্যম। এর দ্বারা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি আত্মিক শান্তি ও স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। প্রত্যেকে নি:সঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতামুক্ত থাকে। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। আর প্রয়োজনের মুহূর্তে একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক এমন একটি সম্পর্ক, যা টিকিয়ে রাখা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। এজন্য আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের আদেশ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করো। তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে, এতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না তাদেরকে, যারা দাম্ভিক-অহংকারী।"[১৮৬]

কেউ যদি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে চায়, তাহলে তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে হবে। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে। তাদের কল্যাণ কামনা করতে হবে এবং তাদেরকে দান-সদকা করতে হবে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, "আল্লাহ তাআলা বলেন– আমি রহমান। আত্মীয়তার বন্ধন হচ্ছে রহিম (رحم)। যা আমি আমার নাম (رحمن) থেকে নির্গত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।"[১৮৭]

যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত রিযিক এবং বরকতময় জীবনের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[১৮৬] সুরা নিসা, আয়াত নং-৩৬

[১৮৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -১৬৯৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬৮০

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি– "যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার রিযিক বৃদ্ধি পাক এবং মৃত্যুর পরও তার সুনাম-সুখ্যাতি বজায় থাকুক, সে যেনো আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে।"[১৮৮]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত উলামায়ে কেরাম বলেন– "দুনিয়াতে এই ব্যক্তির জীবনে বরকত হবে। নেক আমল বেশি বেশি করতে পারবে। তার মূল্যবান সময়গুলো কাজে লাগাতে পারবে, যা তার আখেরাতে কাজে আসবে। আর অনর্থক-বেহুদা কাজ থেকে সে বিরত থাকতে পারবে।"[১৮৯]

পক্ষান্তরে যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে বহু সতর্কবাণী এসেছে এবং এটাকে বিরাট অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, আত্মীয়তা ছিন্ন করার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা অন্ধ দৃষ্টি, বন্ধ হৃদয় আর আল্লাহর লা'নত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে বলেন– "তবে কি তোমরা এই প্রত্যাশা করছো যে, যদি তোমরা শাসন কর্তৃত্ব পাও, তাহলে জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এরাই ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন। ফলে তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন, আর দৃষ্টিকে করেছেন অন্ধ।"[১৯০]

হযরত যুবাইর ইবনে মুতইম রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৯১]

সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হলো– তাদের সাথে ভালো ব্যবহার না করা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করা। তাদের থেকে দূরে দূরে থাকা। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যে অনেক বড় গুনাহ, এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক বক্তব্য এসেছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে এমন একটি সমাজ গঠন হবে, যারা পরস্পরে সুসংহত থাকবে, ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং একে অপরের সহায়তায়

---

[১৮৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৯৬১
[১৮৯] আল মিনহায১১৪/১৬
[১৯০] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং-২৩-২২
[১৯১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬৩৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৯

এগিয়ে আসবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়াদ্রতা এবং সহানুভূতির দিক থেকে তাদের উদাহরণ হলো- একটি মানব দেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন তার সারা দেহে ছেয়ে যায় ব্যাথা আর অনিদ্রা।"[১৯২]

[১৯২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬৬৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৮৬

মুসলিম সমাজে ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকাঃ

একটি মুসলিম সমাজ এমন একটি বড় পরিবার, যার ভিত্তি হলো– পরস্পর ভালোবাসা, সহযোগিতা, সংহতি আর দয়া-মায়ার উপর। এদের দ্বারাই তো কায়েম হবে খোদাভীরু, মানবতাবাদী, নীতিবান ও ভারসাম্যপূর্ণ এক আদর্শ সমাজ। যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ হবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের সকল কাজ পরিচালিত হবে ন্যায়-ইনসাফ ও পরামর্শের ভিত্তিতে। যেখানে বড়রা দয়া করবে ছোটদেরকে। ধনীরা রহম করবে গরীবদেরকে। শক্তিশালীরা সাহায্য করবে দুর্বলদেরকে। এভাবে সমাজের সবাই মিলে হবে এমন একটি দেহ, যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হবে, তখন পুরা দেহটাই ব্যথিত হবে। অথবা তারা হবে এমন কতগুলো ইটের মত, যার একটা অপরটার সাথে একদম ভালো করে জড়িয়ে আছে।

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধঃ

রেগন[১৯৩] প্রশাসনের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন- 'লী অট্‌ওয়াতের'[১৯৪]। তিনি Life পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সংখ্যায় লিখেছিলেন– "আমার অসুস্থতা আমাকে এ বিষয়টা বুঝতে সহায়তা করেছিলো যে, সমাজে যে বিষয়টা অনুপস্থিত, সেটা আমার মধ্যেও অনুপস্থিত। আর তা হলো– পরস্পরে ভালোবাসা ও মুহাব্বতের কমতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের অবক্ষয়...।"

ইসলাম একটি আদর্শ সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে বিস্ময়কর মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও ঐক্য হলো অন্যতম। যা একটি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলে। এটা এমন এক দুর্লভ

---

[১৯৩] রোনাল্ড রেগন। (Ronald reagan) জন্ম: ১৯১১ ইং। মৃত্যু: ২০০৪ ইং। তিনি ছিলেন আমেরিকার ৪০ তম রাষ্ট্রপতি। রাজনীতিতে আসার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন ব্যর্থ চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৮১ সালে রাজনীতিতে আসার পর তিনি হলেন সবার পছন্দের এবং জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি। ১৯৮৪ সালে তিনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৮১ ইং থেকে ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন।

[১৯৪] লী অট্‌ওয়াতের। (Lee Atwater) জন্ম: ১৯৫১ ইং। মৃত্যু: ১৯৯১ ইং। তিনি ছিলেন আমেরিকান রিপাবলিকের রাজনৈতিক উপদেষ্টা, রণকৌশলী এবং রাষ্ট্রপতি রেগন ও সিনিয়র বুশের রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

বিষয়, যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো সমাজে পাওয়া যায় না; অতীতেও না, বর্তমানেও না। "কোথাও এমন পাওয়া যায় না যে, সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ একে অপরকে ভালোবাসবে। পরস্পরে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সবাই নিজেদেরকে একই পরিবারের সদস্য মনে করে একে অপরকে ভালোবাসবে। তাদেরকে শক্তিশালী করবে। প্রত্যেকে তার ভাইয়ের শক্তিকে নিজের শক্তি মনে করবে। তার ভাইয়ের দুর্বলতাকে নিজের দুর্বলতা মনে করবে। নিজের চাহিদাকে পেছনে রেখে তার ভাইকে প্রাধান্য দিবে।"[১৯৫]

মুসলিম সমাজে ভ্রাতৃত্বের অবস্থানঃ

ইসলামী সমাজে ভ্রাতৃত্বের অবস্থান এবং মুসলিম সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে বহু আয়াত এবং হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেসব বিষয় ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে সেসব বিষয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর যেসব বিষয় ভ্রাতৃত্ববোধে ফাঁটল সৃষ্টি করে সেসব বিষয়কে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করে দিয়ে বলেন– "সমস্ত মুমিন ভাই ভাই।"[১৯৬]

এখানে জাতি, বংশ আর বর্ণের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করা হয়নি; বরং ভ্রাতৃত্ব হবে শুধুমাত্র ঈমানের ভিত্তিতে। হযরত সালমান ফারসী, বেলাল হাবশী আর সুহাইব রুমীদেরকেও আরবদের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিলো শুধুমাত্র ঈমানের ভিত্তিতেই।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ঈমানের ভিত্তিতে এই ভ্রাতৃত্ববোধ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তোমরা সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো।"[১৯৭]

---

[১৯৫] মালামিহুল মুজতামাইল মুসলিম:১৩৮
[১৯৬] সুরা হুজুরাত, আয়াত নং-১০
[১৯৭] সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১০৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন মসজিদ নির্মাণ করার পরপরই আনসার এবং মুহাজির সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। ভালোবাসা এবং স্বার্থত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ভ্রাতৃত্বের কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করে দিয়ে বলেন– "আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনায় বসবাস করছিলো এবং ঈমান এনেছিলো, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, এর জন্য তারা ঈর্ষা পোষণ করে না। তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"[১৯৮]

এই ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে আনসারী সাহাবায়ে কেরাম ভালোবাসা এবং স্বার্থত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে কোথাও এর কোনো নজীর নেই। আনসারী সাহাবীগণ তাদের মুহাজির ভাইদের জন্য নিজের অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দিয়েছেন। নিজের দুই স্ত্রী থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইয়ের সাথে তার বিবাহ দিয়েছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় আসলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাঝে এবং সা'দ ইবনে রবী' আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। হযরত সা'দ রাজিয়াল্লাহু আনহু তার সমস্ত সম্পদ ভাগ করে অর্ধেক সম্পদ এবং তার দু'জন স্ত্রীর মধ্য হতে যেকোনো একজনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ জানালেন। তিনি উত্তরে বললেন– "আল্লাহ তাআলা আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আপনি শুধু আমাকে এখানকার বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন...।"[১৯৯]

একটি শান্তিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ আদর্শ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে দুর্বল করে দেয় এবং পরস্পরে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, ইসলাম সেসব বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে বলেছে।

---

[১৯৮] সুরা হাশর, আয়াত নং-৯

[১৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৩৭২২ জামে তিমিযী, হাদীস নং-১৯৩৩

কাউকে উপহাস এবং বিদ্রূপ করাকে হারাম করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ যেনো কাউকে উপহাস না করে। কেননা, হতে পারে যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেনো অন্য নারীকে উপহাস না করে। কেননা, হতে পারে যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম।"[২০০]

অন্যকে তুচ্ছ করা আর নিজ বংশের গর্ব করাকে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং একে অপরের মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ উপনাম কতইনা নিকৃষ্ট বিষয়! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম।"[২০১]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন– গীবত, অন্যের দোষ চর্চা আর মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা করাকেও। কেননা, এসব নিম্ন মানের নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমেই একটি সুন্দর সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণাও গুনাহ। আর তোমরা অন্যের গোপন বিষয় তালাশ করো না। এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।"[২০২]

সমাজে যখন পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ এবং দূরত্ব সৃষ্টি হবে, তখন ইসলামের শিক্ষা হলো– তাদেরকে দয়া-মায়া এবং আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে পরস্পরে মিলমিশ করে দেয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ প্রদান করে বলেন– "আমি কি তোমাদেরকে নামাজ, রোজা এবং দান-সদকা থেকেও উত্তম আমল বলে দিবো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন– তা হলো পরস্পরের

---

[২০০] সুরা হুজুরাত, আয়াত নং-১১
[২০১] সুরা হুজুরাত, আয়াত নং-১১
[২০২] সুরা হুজুরাত, আয়াত নং-১২

মাঝে মীমাংসা করে দেয়া। আর মানুষের মাঝে ঝগড়া বাধানো ধ্বংসের কারণ।"[২০৩]

এমনকি পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রয়োজনে কৌশলে মিথ্যা বলারও অনুমতি দিয়েছে। কেননা, ঝগড়া-বিবাদ একটি ইসলামী সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ছাড়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে (মিথ্যা বলে) পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করে দেয়। কেননা, সে কল্যাণের জন্যই মিথ্যা বলে। আর কল্যাণের জন্যই চোগলখুরি করে।"[২০৪]

ভ্রাতৃত্বের অধিকার এবং কর্তব্যঃ

ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণে ইসলাম এ সংক্রান্ত এমন কিছু অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা প্রত্যেকটি মুসলমানকেই মেনে চলতে হয়। এগুলোকে দ্বীনের এমন অংশ বানানো হয়েছে, মৃত্যুর পর যার হিসাব নেয়া হবে। আর এগুলোকে এমন আমানত বানানো হয়েছে, যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না। পরস্পর ধোকাবাজি করো না। পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তার অগোচরে শত্রুতা করো না। এবং একে অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সুতরাং কেউ কাউকে অত্যাচার করবে না, অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না। ...একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। একজন মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের জান-মাল-ইজ্জত-আবরু (নষ্ট করা) হারাম।"[২০৫]

উক্ত হাদীসে 'অপদস্ত না করা'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বলেন- "অপদস্ত করা মানে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা । সুতরাং যদি কেউ জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কারো কাছে সাহায্য কামনা করে, তাহলে

---

[২০৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৪৯১৯ জামে তিমিযী, হাদীস নং-২৫০৯
[২০৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৫৪৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬০৫
[২০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- -২৫৬৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৭৭১৩

তাকে সাহায্য করা তার জন্য ওয়াজিব, যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় এবং শরিয়তের পক্ষ থেকে কোন বাধা না থাকে।"[২০৬]

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমার ভাইকে সাহায্য কর। চাই সে জালেম হোক অথবা মাজলুম। এক লোক বলল হে আল্লাহর রাসুল! মাজলুম হলে তাকে সাহয্য করব বুঝলাম; কিন্তু জালেম হলে তাকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন– তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। এটাই তার সাহায্য।"[২০৭]

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামী সমাজ ছাড়া এমন মানবতাবাদি আর কোন সমাজ আছে, যেখানে একজন ব্যক্তি অভাবে পড়লে তার প্রয়োজন পুরা করা, মাজলুম হলে তাকে সাহায্য করা, আর যদি জালেম হয় তাহলে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য?!

এটা শুধুমাত্র ইসলামী সমাজেই আছে। কেননা, ইসলামে রয়েছে উন্নত ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যবদ্ধ চেতনা। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের বিপদ-আপদে পাশে দাড়ায় এবং তাকে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করে। যেখানে পরস্পরে কোন হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, নেই কোন শত্রুতা । আপসে মিলে-মিশে থাকাটা যেখানে অবশ্য কর্তব্য। আর এভাবেই হয় সংহতিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এক সুন্দর সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ।

[২০৬] আল মিনহায১২০/১৬

[২০৭] জামে তিমিযী, হাদীস নং-২২৫৫ সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৫৫২

ইসলামী সমাজে সহযোগিতা-সহমর্মিতা

ভূমিকাঃ

ইসলামী শরীয়ত যেখানে তার মুসলিম অনুসারীদেরকে সুখে-দুখে এবং কষ্ট-বেদনায় একে অপরের সহমর্মিতা এবং সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে প্রয়োজন এবং অভাবের মুহূর্তে একে অপরের সহযোগিতার কথাতো বলাই বাহুল্য।

ইসলাম মনে করে– সমস্ত মুসলমান হলো ইট দ্বারা গঠিত একটি প্রাসাদের মত। যেখানে একটি ইট আরেকটা ইটকে শক্তিশালী করে। এজন্য হযরত আবু মুসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "এক মুসলিম আরেক মুসলিমের জন্য প্রাসাদের মত। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।"[২০৮]

আবার এভাবেও বলা যায় যে, সমস্ত মুসলমান একটি দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সারা দেহটাই ব্যাথিত হয়ে পড়ে। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "পরস্পর ভলোবাসা, দয়াদ্রতা এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমান একটি দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহ ব্যাথা ও অনিদ্রায় ছেয়ে যায়।"[২০৯]

ইসলামে ব্যাপক সহযোগিতাঃ

ইসলামে সামাজিক সহযোগিতা শুধু জাগতিক কল্যাণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়- যদিও এটা সহযোগিতার মূল ক্ষেত্র- বরং ব্যক্তি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সমাজের সকল প্রয়োজনেই রয়েছে ইসলামে সহযোগিতার বিধান। চাই সে প্রয়োজনটা হোক জাগতিক বা নৈতিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক। কেননা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলো এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

ইসলামে সহযোগিতামূলক সকল শিক্ষা মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক সহযোগিতাকেই বুঝায়। এজন্য দেখা যায় ইসলামী সমাজে নেই কোনো

---

[২০৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬৮০ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৮৫

[২০৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৫৬৬৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬৭৫১

ব্যক্তিবাদ, স্বার্থবাদ এবং সংকীর্ণ মনোভাব। বরং ইসলামী সমাজে রয়েছে আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব, উদার দানশীলতা আর সর্বদা সৎ কাজে সহযোগিতা।

ইসলামে সার্বজনীন সহযোগিতাঃ

ইসলামের এই সামাজিক সহযোগিতা শুধু মুসলমানরাই ভোগ করবে না; বরং ভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন ধর্মের প্রত্যেক মানুষ এই সহযোগিতা ভোগ করার অধিকার রাখে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন– "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়নদেরকে ভালোবাসেন।"[২১০]

কেননা, সহযোগিতা-সংহতির মূল কারণ হলো– মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলস্থলে চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি। আর আমার সকল সৃষ্টির মাঝে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[২১১]

ইসলামী সমাজে মানুষের পরস্পর সহযোগিতা-সংহতির ব্যাপারে যে সকল নীতিমালা রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম হলো এই আয়াতটি। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন– "ভালো কাজ এবং খোদাভীতির ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো। মন্দকাজ এবং সীমালঙ্ঘনে একে অপরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।"[২১২]

ইমাম কুরতুবী[২১৩] রহ: বলেন– "এ আয়াতে সকল মানুষকেই ভালো কাজে সহযোগিতার আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা সবাই একে অপরকে সহযোগিতা করবে।"[২১৪]

---

[২১০] সুরা মুমতাহিনাহ, আয়াত নং-৮

[২১১] সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৭০

[২১২] সুরা মাইদাহ, আয়াত নং-২

[২১৩] ইমাম কুরতুবী রহ: । তার পুরা নাম: মুহাম্মাদ ইবনে আাহমাদ আল আনসারী আল খাযরাজী আল মালেকী আল কুরতুবী। তিনি অনেক উঁচু মাপের একজন মুফাসসির ছিলেন। তার প্রসিদ্ধ কিতব

ইমাম মাওয়ারদী[২১৫] রহঃ বলেন– "আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে মানুষের সহযোগিতার সাথে সাথে খোদাভীতিও সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কেননা, খোদাভীতিতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আর সহযোগিতায় রয়েছে মানুষের সন্তুষ্টি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং মানুষের সন্তুষ্টি– দু'টিই পেলো, সেই প্রকৃত সফলকাম এবং পরম সৌভাগ্যবান।"[২১৬]

ইসলামে যাকাতের গুরুত্বঃ

পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা– ধনীদের সম্পদে একটা নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে– অভাবী ও গরীবদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–" যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত অধিকার– অভাবী এবং বঞ্চিতদের জন্য।"[২১৭]

"যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্যের অধিকার রয়েছে, শরিয়ত নিজেই সেই পরিমাণের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছে। আর এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দানে রয়েছে– ধনীদেন দানশীলতা, নেককারদের বদান্যতা, গরীবের প্রতি দয়াদ্রতা, পরস্পরে ভালোবাসা, দানশীলতায় উদ্বুদ্ধ করা আর ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদানের এক অনুপম শিক্ষা।"[২১৮]

শরিয়তকর্তৃক এই নির্ধারিত পরিমাণের উপযুক্ত কারা, সেটাও পবিত্র কুরআনেই বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "নিশ্চয়ই সদকা হচ্ছে গরীব-মিসকিনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য। আর যাদের অন্তর (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করতে হয়,তাদের জন্য। তা বণ্টন করা যায়- গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে। ঋণগ্রস্তদের মধ্যে। আল্লাহর রাস্তায়। এবং

হলো- আল জামে' লি আহকামিল কুরআন। যা তাফসীরে কুরতুবী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মৃত্যু বরণ করেন ৬৭১ হিজরি মোতাবেক ১২৭৩ ইংরেজিতে। (আল আ'লাম: ৫/৩২২)

[২১৪] তাফসীরে কুরতুবী:৪৬৪৭/৬ :

[২১৫] ইমাম মাওয়ারদী রহঃ। তার পুরা নাম: আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব। তিনি ছিলেন একাধারে ফেকাহ, উসূল এবং তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম। তিনি বিচারপতি ছিলেন। কয়েকটা শহরে তাকে বিচারপতি বানানো হয়েছিলো। তার প্রসিদ্ধ কিতাব– আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন। আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন- ৩৬৪ হিজরি মোতাবেক ৯৭৪ ইংরেজিতে। আর মৃত্যুবরণ করেন- ৪৫০ হিজরি মোতাবেক ১০৫৮ ইংরেজিতে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

[২১৬] আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন: ১৯৭-১৯৬

[২১৭] সুরা মাআরিজ, আয়াত নং-২৫-২৪

[২১৮] আত তাকাফুলুল ইজতিমায়ী:৭

মুসাফিরদের মধ্যে। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ তাআলা মহা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।”[২১৯]

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা, সমাজের বিরাট এক অংশ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়। আর যাকাত এতো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার মূল কারণ হলো- এর মাধ্যমে অন্যের সহযোগিতা এবং সহায়তা করা হয়। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এটা ছাড়া ইসলামই পূর্ণতা লাভ করে না। যাকাত যাকাতদাতার অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। সুতরাং যাকাতগ্রহীতার উপকারের আগেই যাকাতদাতার উপকার হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন- “তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।”[২২০]

এতে সন্দেহ নেই যে, যাকাত যেমনিভাবে যাকাতদাতার অন্তর থেকে লোভ, কৃপণতা ও আত্মস্বার্থকে বের করে দেয়; তেমনিভাবে গরীব, অভাবী এবং যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তির অন্তর থেকে বের করে দেয়- বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং ধনী ও বিত্তবানদের সাথে শত্রুতা। আর এই ফরজটি আদায় করার মাধ্যমে সমাজে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা-মুহাব্বত, দয়া-মেহেরবানি ও সহায়তা-সহনশীলতা কয়েকগুণে বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী শরিয়ত শাসকদেরকে এই অনুমতি দিয়েছে যে, তারা ধনীদের থেকে যাকাতের মাল সংগ্রহ করবে এবং তা গরীবদের মাঝে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী পৌঁছে দিবে। মুসলমানদের সমাজে এটা মেনে নেয়া যায় না যে, কেউ পেট ভরে খেয়ে পূর্ণ তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে, আর তার প্রতিবেশি কেউ না খেয়ে কষ্টে থাকবে। বরং ইসলামের আদর্শ হলো- সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করবে। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- “সেই ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি, যে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত যাপন করে, আর তার পাশের প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত থাকে, যা সে জানে।”[২২১]

---

[২১৯] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-৬০
[২২০] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-১০৩
[২২১] শুআবুল ঈমান, হাদীস নং- -৩২৩৮আল আদাবুল মুফরাদ:১১২

ইমাম ইবনে হাযাম[২২২] রহঃ বলেন– “প্রত্যেক শহরের ধনীদের উপর এটা ওয়াজিব যে, তারা গরীবদের নিকট যাকাতের মাল পৌঁছে দিবে। যদি তারা গরীবদেরকে যাকাত না দেয়, তাহলে সরকার তাদেরকে এ কাজে বাধ্য করবে। কেননা, মুসলমানদের সকল মালের ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। শীত ও গরমের প্রয়োজনীয় পোশাকের ব্যবস্থা করবে। রোদ, বৃষ্টি, গরম আর মানুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তাদের থাকার ঘরের ব্যবস্থা করবে।”[২২৩]

জাগতিক সহযোগিতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো– অভাবীদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করে দিয়ে দান বন্ধ করা যাবে না; বরং তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করার পরও অতিরিক্ত আরও দান করে যাবে। যা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কথা দ্বারা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন– “তোমরা গরীবদেরকে বারবার দান করতে থাকো, যদিও তাদের কারও একশত উট হয়ে যায়।”[২২৪]

সাহায্য-সহযোগিতার ফযিলত সংক্রান্ত কিছু হাদীসঃ

মুসলিম সমাজে একে অপরের প্রতি সহযোগিতা, সহানুভূতির ফযিলত-উৎসাহ এবং ইসলামে এর অবস্থান সম্পর্কে অনেক হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। হযরত আবু মুসা আশআরী রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– “আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে যায়, অথবা মদীনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনের খাবার-ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তারা নিজেদের কাছে থাকা সমস্ত সম্পদকে একত্রিত করে একটি কাপড়ে জমা করে। এরপর একটি পাত্র দ্বারা মেপে

---

[২২২] ইবনে হাযাম আন্দালুসী। তার পুরা নামঃ আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ইবনে সাঈদ আয যাহেরী। তার জন্মঃ ৩৮৪ হিজরি মোতাবেক ৯৯৪ ইংরেজিতে। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন বড় ইমাম এবং ইলমে ফিকহের বড় পণ্ডিৎ। তিনি দাউদ যাহেরী রহঃ এর অনুসরণ করে কুরআন-হাদীসের সরাসরি কথাগুলো গ্রহণ করতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন- ৪৫৬ হিজরি মোতাবেক ১০৬৪ ইংরেজিতে।

[২২৩] আল মুহাল্লা:৪৫২/৬

[২২৪] আল মুহাল্লা:৪৫২/৬

প্রত্যেকে সমানভাগে বণ্টন করে নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভূক্ত) আর আমিও তাদের (দলভূক্ত)।"[২২৫]

ইবনে হাজার রহ: তার বিখ্যাত কিতাব ফাতহুল বারী'তে লিখেন– "অর্থাৎ তারা আমার সাথে সম্পৃক্ত। আর এটা একজন মুসলমানের জন্য কতবড় মর্যাদার বিষয়।"[২২৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং কেউ কাউকে অত্যাচার করবে না এবং দুশমনের হাতে সোপর্দ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব-অনটন দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার অভাব-অনটন দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদানস্বরূপ কিয়ামতের দিন তাকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি দান করবেন। আর যে মুসলমানের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন।"[২২৭]

ইমাম নববী রহ: বলেন– "এই হাদীসে মুসলমানের সাহায্য করা, তার বিপদ দূর করা এবং তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ফযিলত বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ দ্বারা বা ক্ষমতা দ্বারা বা সহযোগিতা দ্বারা; এমনকি যে ব্যক্তি ইশারায় বা চিন্তা-ফিকির করে এমনকি খবর দেয়ার মাধ্যমেও কাউকে সাহায্য করে, সেও এই ফযিলতের অন্তর্ভূক্ত।"[২২৮]

এই হলো মুসলিম সমাজে পরস্পর সহযোগিতার এক উত্তম চিত্র।

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই চেষ্টা করবে, সমাজকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করতে। প্রত্যেক সামর্থবান এবং ক্ষমতাবানের দায়িত্ব হলো– "সমাজের প্রতিটি ভালো কাজেই সমাজকে সাহায্য করবে। আর সমাজের প্রতিটি মানবশক্তি মানুষের কল্যাণ সংরক্ষণ করবে এবং সমাজকে বিপদমুক্ত রাখার চেষ্টা করবে। সমাজ বিনির্মাণ এবং সমাজকে একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে, ক্ষতিকর দিকগুলোকে প্রতিহত করার মাধ্যমে সবাইকে

---

[২২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৩৫৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫০০
[২২৬] ফাতহুল বারী:১৩০/৫
[২২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৩১০ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৮০
[২২৮] আল মিনহায১৩৫/১৬

এগিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অপরের সাথে হাসি-খুশি, সহানুভূতি আর সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। আর প্রত্যেকে প্রত্যেককে নিজের ভাই মনে করবে।"[২২৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাবীদের সাহায্য করতে বলেছেন এবং সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের অনুভূতিকে সম্মান করতে বলেছেন। তিনি বলেন– "সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নিজের পক্ষ থেকে সদকা করতে হবে। এক সাহাবী বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! আমার তো এতো সম্পদ নেই, আমি কিভাবে সদকা করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- অন্ধকে পথ বলে দেয়া, বোবা ও বধিরকে এমনভাবে পথ দেখানো, যাতে তারা বুঝতে পারে, প্রত্যেকের সম্মান বজায় রেখে তাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া, কোনো সাহায্যপ্রার্থীর প্রয়োজন পূরণে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং পূর্ণ শক্তি নিয়ে দুর্বলের সাহায্যে এগিয়ে আসা; এসবই তোমার পক্ষ থেকে সদকার অন্তর্ভূক্ত।"[২৩০]

বর্তমানে এ জাতীয় মূল্যবোধগুলিকে উন্নত সভ্যতার নিদর্শন বিবেচনা করা হয়। অথচ বহু আগে থেকেই ইসলাম এগুলোকে আইন-কানুন বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু তখন কে শোনে অন্ধের কথা আর বোবা ও বধিরের দিকনির্দেশনা!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাসকদেরকে এ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, তারা দ্রুত জনগণের চাহিদা পূরণ করবে। হযরত আমর ইবনে মুররাহ হযরত মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি– "যে শাসক গরীব, মিসকীন এবং সাহায্যপ্রার্থীর আগমনের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখে, এ ধরণের লোকের দারিদ্র্য, অভাব এবং প্রয়োজনের সময় আল্লাহ তাআলাও আকাশের দরজা বন্ধ রাখবেন। এ কথা শোনার পর হযরত মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু মানুষের প্রয়োজনের খোঁজখবর নেয়ার জন্য আলাদা এক লোককে নিযুক্ত করে দিলেন।"[২৩১]

---

[২২৯] আত তাকাফুলুল ইজতিমায়ী:১৩

[২৩০] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং- ৩৩৭৭ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- -২১৫২২

[২৩১] জামে তিমিযী, হাদীস নং- -১৩৩২ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৮০৬২

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু তালহা আনসারী রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে; যেখানে (সাহায্য না পেলে) তার মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলাও তাকে এমন স্থানে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন, যেখানে সে সাহায্য কামনা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের মান-ইজ্জত রক্ষার্থে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে সে সাহায্য কামনা করে।"[২৩২]

অন্যের সাহায্য করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতগণের বক্তব্য শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। তারা বলেন– "অন্যকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। কেউ নামাজে দাড়ালো, এমতাবস্থায় অপর একজন কোনো কঠিন বিপদে পড়ে তার কাছে সাহায্য চাইলো বা পানিতে পড়ে গেলো বা আগুনে পুড়ে গেলো বা কোনো ধ্বংসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে; এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির নামাজ ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। এই মুহূর্তে যদি সে ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তাহলে তার জন্য এদেরকে সাহায্য করা ফরজে আইন বা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি সে ছাড়া অন্য কেউ থাকে সাহায্য করার মত, তাহলে তার জন্য সাহায্য করা ফরজে কেফায়া। এটা ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।"[২৩৩]

মোটকথা, পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা হলো ইসলামী সভ্যতার একটি মৌলিক স্তম্ভ। এর রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। যেমনঃ কারও বিপদে সাহায্য করা। সহযোগিতা করা। কারও দুখে সহমর্মী হওয়া। কেউ অভাবে পড়লে তার অভাব দূর করার জন্য এগিয়ে আসা। অন্যের কষ্টে শান্তনা দেয়া। সর্বাবস্থায় একে অপরের খোঁজখবর রাখা।

---

[২৩২] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -৪৮৮৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬৪১৫
[২৩৩] আল মুগনী:২০২/৮-৫১৫/৭

ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও বাস্তবতা

ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্বঃ

ন্যায়বিচার হলো মানবিক মূল্যবোধের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলাম যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন– সর্বক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য পবিত্র কুরআনে ন্যায়বিচারকে নবী-রাসুল পাঠানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসুলদেরকে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড দিয়েছি। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"[২৩৪]

"ন্যায়বিচার বা ইনসাফের গুরুত্ব এরচেয়ে বেশি আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যত নবী-রসুল পাঠিয়েছেন, আর তাদেরকে যত কিতাব দিয়েছেন, সবকিছুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো দুনিয়াতে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং বলা যায়, ন্যায়বিচার বা ইনসাফের জন্যই কিতাব নাযিল হয়েছে। ইনসাফের জন্যই নবী-রসুল প্রেরিত হয়েছে। আর এই ইনসাফ দ্বারাই আসমান-জমিন টিকে আছে।"[২৩৫]

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সর্বদা ন্যায়ের উপর থাকতে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আদেশ দিয়েছে। যদিও তা আমাদের কাছে অপছন্দ লাগে বা আমাদের বিরুদ্ধে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।"[২৩৬]

তিনি আরও বলেন– "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে অবিচল থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। সুবিচার করো, এটাই খোদাভীতির

---

[২৩৪] সুরা হাদীদ, আয়াত নং-২৫
[২৩৫] মালামিহুল মুজতামাইল মুসলিম:১৩৩
[২৩৬] সুরা নিসা, আয়াত নং-১৩৫

অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত।"[২৩৭]

আল্লামা ইবনে কাসীর[২৩৮] রহঃ বলেন– "কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যাতে করে তোমাদেরকে তাদের সাথে ন্যায়বিচার করা থেকে বিরত না রাখে। বরং প্রত্যেকের সাথেই তোমরা ন্যায়বিচার করো, চাই সে বন্ধু হোক বা শত্রু।"[২৩৯]

সুতরাং ইসলামে ন্যায়বিচারের বেলায় কারও প্রতি ভালোবাসা এবং শত্রুতার কোনো প্রভাব নেই। জাত-বংশের কোনো পার্থক্য নেই। অর্থ-বিত্তেরও কোনো দখল নেই। পার্থক্য করা হয় না কোনো মুসলিম-অমুসলিমের মাঝেও। বরং রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমান-অমুসলমান সবাই ন্যায়বিচার ভোগ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। চাই তাদের মধ্যে শত্রুতা থাক অথবা ভালোবাসা।

ইসলামে ন্যায়বিচারের অবস্থানঃ

এক মাখযুমী মহিলার ক্ষেত্রে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের সুপারিশের ঘটনা দ্বারাই ইসলামে ন্যায়বিচারের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত উসামা বিন যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বনী মাখযুম গোত্রের এক মহিলার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। যাতে চুরির অপরাধে তার হাত না কাটা হয়। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে গেলেন। এরপর ইসলামের নীতি-আদর্শ, ন্যায়বিচার এবং সমাজের ধনী-গরীব বিচারের কাঠগড়ায় সবাই সমান– এসব বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বললেন– "হে লোকসকল! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে যখন কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। আর যদি কোনো দুর্বল লোক চুরি করতো, তবে তারা

---

[২৩৭] সুরা মাইদাহ, আয়াত নং-৮

[২৩৮] আল্লামা ইবনে কাসীর রহঃ। তার পুরা নামঃ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর আদ দিমাশকী। তার জন্ম- ৭০১ হিজরি মোতাবেক ১৩০২ ইংরেজিতে। তিনি ছিলেন অনেক বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং ঐতিহাসিক। তিনি শামের বসরা নগরীর কোনো এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– তাফসীরে ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি। তিনি ৭৭৪ হিজরি মোতাবেক ১৩৭৩ ইংরেজিতে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। (যাইলু তাযকিরাতুল হুফফাজ:৫৭-৫৮)

[২৩৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর:৪৩/২

তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করতো, তবুও আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[২৪০]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খায়বারের বিজয় দান করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসীদেরকে আপন অবস্থায় সেখানেই থাকতে দিলেন। এবং খায়বারের সমস্ত ফসল খায়বারবাসী ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে অর্ধেক অর্ধেক হারে ভাগ করে নিলেন। পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে খায়বারে পাঠালেন অনুমান করে অর্ধেক ফসল নিয়ে আসতে। তিনি এসে ইহুদীদেরকে বললেন- "হে ইহুদীর দল! আমি মনে করি তোমরা হলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছো। আর আল্লাহকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছো। তোমাদের প্রতি এই ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাদের উপর জুলুম করবো না। আমার ধারণা অনুযায়ী খায়বারে বিশ হাজার ওয়াসাক[২৪১] খেজুর আছে। এখন তোমরা যদি চাও তাহলে তোমাদের জন্যও একটা অংশ দেয়া হবে। আর যদি না চাও, তাহলে সম্পূর্ণটাই আমি নিয়ে নিবো। ইহুদীরা বললো- এভাবেই তো আসমান এবং জমিনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আমাদের অংশ গ্রহণ করবো।"[২৪২]

উক্ত হাদীসে এটা স্পষ্ট যে, ইহুদীদের প্রতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহার প্রচণ্ড ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি জুলুম করেননি। বরং স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি কোনো জুলুম করবেন না। আর দুই ভাগের মধ্য থেকে তারা যে ভাগ চাবে, সেটাই তাদেরকে দিয়ে দিবেন।

ইসলামে ন্যায়বিচারের রহস্যঃ

ইসলামে ন্যায়বিচারের রহস্য হলো- ইনসাফ বা ন্যায়বিচার, এই জমিনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি দাড়িপাল্লা। এর দ্বারা মেপে মেপে দুর্বলের অধিকার আদায় করা হবে। জালেম এবং মাজলুমের মাঝে ন্যায়বিচার করা

---

[২৪০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৩২৮৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৮৮

[২৪১] ১ ওসাক= ৬০ সা'। ১ সা'= ৩.৩৩০ কেজি। ৬০ সা'= (৩.৩৩০*৬০) ২০০ কেজি বা ১ ওসাক। সুতরাং ২০ হাজার ওসাক= (২০০০০*২০০) ৪০০০০০০ কেজি। যা বর্তমান মণ হিসেবে হয় (৪০০০০০০/৩৭.৩২) ১০৭১৮১ (এক লক্ষ সাত হাজার একশত একাশি) মণ। (অনুবাদক)

[২৪২] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- -১৪৯৯৬ সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫১৯৯

হবে এবং এর মাধ্যমে হকদারকে সহজভাবে সঠিক জায়গা থেকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে।

ন্যায়বিচার হলো ইসলাম ধর্মের এমন একটি হুকুম, যা সমাজের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায়বিচার এবং এর মাধ্যমে শান্তি লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ইসলাম যেহেতু দয়া-মায়া এবং সহানুভূতি না দেখিয়ে মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-গরীব সকল মানুষের সাথেই ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছে, সুতরাং এক্ষেত্রে ভালোবাসার কোনো দখল চলবে না, শত্রুতারও কোনো প্রভাব চলবে না।

আল্লাহ তাআলা সবার আগে নিজের সাথে ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তারা নিজের হক, তার রবের হক এবং অন্যদের হকের মাঝে ভারসাম্যতা রক্ষা করে। হযরত আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন তার স্ত্রীর প্রতি খেয়াল না রেখে সারাদিন রোজা আর সারারাত নামাজ পড়ে স্ত্রীর হক খর্ব করতে লাগলেন, তখন হযরত সালমান ফারসী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছিলেন- "তোমার উপর তোমার রবের কিছু হক আছে। তোমার নিজের কিছু হক আছে এবং তোমার পরিবারেরও কিছু হক আছে। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের হক আদায় করো।"[২৪৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ফারসীর এ কথাকে সমর্থন করেছিলেন।

ইসলাম কথা বলার ক্ষেত্রে ইনসাফ করার আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "তোমরা যখন কথা বলো, তখন ইনসাফ করো। যদিও তারা তোমাদের নিকটাত্মীয় হয়।"[২৪৪]

ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফের আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে,

---

[২৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -১৮৩২ জামে তিমিযী, হাদীস নং-২৪১৩

[২৪৪] সুরা আনআম, আয়াত নং-১৫২

তখন ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[২৪৫]

পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করার ক্ষেত্রেও ইসলাম ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর যদি মুমিনদের দু'দল বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবসেন।"[২৪৬]

ইসলামে জুলুম-অত্যাচার হারামঃ

ইসলাম ন্যায়বিচারের প্রতি যতটা আদেশ দিয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছে, তারচেয়ে অনেক কঠিনভাবে জুলুমকে নিষেধ করেছে এবং চরমভাবে ইসলাম জুলুমের বিরোধিতা করেছে। চাই জুলুম নিজের সাথে হোক বা অন্যের সাথে। বিশেষত শক্তিশালীরা জুলুম করে থাকে দুর্বলদের উপর। ধনীরা জুলুম করে গরীবদের উপর। শাসকরা জুলুম করে জনগণের উপর। সবার সাথে সবধরণের জুলুমই হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। যে যত দুর্বল, তার সাথে জুলুম করলে গুনাহও ততো প্রবল।[২৪৭]

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে আমার বান্দারা! আমি আমার উপর জুলুমকে হারাম করেছি। আর তোমাদের মাঝেও জুলুমকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের সাথে জুলুম করো না।"[২৪৮]

---

[২৪৫] সুরা নিসা, আয়াত নং-৫৮
[২৪৬] সুরা হুজুরাত, আয়াত নং-৯
[২৪৭] মালামিহুল মুজতামাইল মুসলিম:১৩৫
[২৪৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২১৪৫৮ শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৭০৮৮

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন– "মাজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো। কেননা, এর মাঝে এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।"[২৪৯]

তিনি আরও বলেন– "তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

১. রোজাদারের দুআ, যখন সে ইফতার করে।

২. ন্যায়বিচারক শাসকের দুআ।

৩. মজলুমের বদদোয়া। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেন। আর আল্লাহ তাআলা বলেন- আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো, যদিও তা কিছুটা বিলম্বে হয়।"[২৫০]

এই হলো ইনসাফ এবং ন্যায়বিচারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইসলামী সমাজে যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা দাড়িপাল্লা।

---

[২৪৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪০০০

[২৫০] জামে তিমিযী, হাদীস নং- -৩৫৯৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৮০৩০

ইসলামে মমতাবোধ: গুরুত্ব ও কয়েকটি নমুনা

ইসলামী শরিয়তে মমতাবোধের গুরুত্বঃ

প্রথমত যদি আমরা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব পবিত্র কুরআন– যা সমস্ত মুসলমানের সংবিধান এবং ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস– এর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায়, সুরা তাওবা ছাড়া প্রতিটি সুরাই শুরু হয়েছে বিসমিল্লাহ দ্বারা। বিসমিল্লাহ'র মধ্যে 'রহমান' (করুণাময়) এবং 'রহীম' (দয়ালু) নামক আল্লাহ তাআলার দুটি সিফাত রয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট, যেহেতু পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি সুরা শুরু করা হয়েছে এই দু'টি সিফাতের মাধ্যমে, তাহলে ইসলামী শরিয়তে করুণা ও দয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি।

আরেকটি বিষয় হলো– "আরবীতে রহমান এবং রহীম এ দুটি শব্দের অর্থ প্রায় কাছাকাছি। উলামায়ে কেরাম এ দু'টি শব্দের পার্থক্য করতে গিয়ে অনেক ব্যাখ্যা এবং মতামত পেশ করেছেন।"[২৫১]

আল্লাহ তাআলা চাইলে এখানে রহমতের গুণের সাথে তার অন্যান্য গুণবাচক নামও উল্লেখ করতে পারতেন। যেমন: আযীম (অনেক বড়) হাকীম (অনেক জ্ঞানী) সামী' (অধিক শ্রবণকারী) বাছীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি। আবার চাইলে দয়ার গুণের সাথে এমন কঠিন কোনো গুণবাচক নাম উল্লেখ করতে পারতেন, যার মাধ্যমে দয়া এবং কঠোরতা– এ দু'টির মাঝে ভারসাম্যতা বজায় থাকতো। যেমন: জাব্বার (প্রতাপশালী) মুনতাকীম (শাস্তিদাতা) কাহহার (পরাক্রান্ত) ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি সুরার শুরুতে দয়া-মায়ার অর্থবোধক কাছাকাছি দু'টি শব্দ এনে আমাদের নিকট এটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে– নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার অন্যান্য সকল গুণের আগে হলো দয়া-মায়া এবং রহমতের গুণ। আর দয়া-মায়ার সাথে কোনো কাজ করলে এটার প্রভাব বেশি পড়ে। পরস্পরে শত্রুতা তৈরি হয় না।

এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়, যদি আমরা পবিত্র কুরআনের দিকে তাকাই। আমরা দেখতে পাই, পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম সুরা হলো সুরা ফাতেহা।[২৫২]

---

[২৫১] ফাতহুল বারী:৩৫৯-৩৫৮/১৩

[২৫২] পবিত্র কুরআনের সুরাসমূহের ক্রমবিন্যাস আল্লাহ প্রদত্ত। অর্থাৎ কুরআনের একেক আয়াত একেক সময় নাযিল হয়েছে ঠিক, কিন্তু কোন আয়াতের পর কোন আয়াত এবং কোন সুরার পর কোন সুরা

অন্যান্য সুরার মত এ সুরাটিও শুরু হয়েছে বিসমিল্লাহ দ্বারা। যার মধ্যে 'রহমান' ও 'রহীম' দু'টি সিফাত রয়েছে। এরপর আবার দেখা যায় যে, সুরা ফাতেহার আয়াতের মধ্যে এ দু'টি সিফাত আবারও রয়েছে। পবিত্র কুরআন শুরুও হয়েছে এ সুরার মাধ্যমেই। আর সুরা ফাতেহা এমন একটি সুরা, যা প্রত্যেক মুসলমানকে প্রত্যেকদিন নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পড়তে হয়। অর্থাৎ একজন মুসলমান এক রাকাত নামাজে রহমান শব্দটি কমপক্ষে দুইবার পড়ে। আর রহীম শব্দটিও পড়ে কমপক্ষে দুইবার। সুতরাং একজন বান্দা প্রত্যেক রাকাতে কমপক্ষে চারবার তার রবের রহমতের কথা স্মরণ করে। এভাবে একজন মুসলমান দৈনিক সতেরো রাকাত ফরজ নামাজে কমপক্ষে আটষট্টিবার রহমত এবং দয়া-মায়ার কথা বলে। দেখা গেলো, নামাজের মত এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ এক পবিত্র অবস্থায়ও সবচেয়ে বেশি যে চিন্তাটা আসে, সেটা হলো– দয়া-মায়ার চিন্তা।

রহমতের নবী, দয়ার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ তাআলার অসীম দয়ার কথা বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে রেখেছেন– আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রগামী। এই লেখাটা আল্লাহ তাআলার আরশে লেখা আছে।"[২৫৩]

এই হাদীসে এটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, দয়া রাগের উপর অগ্রগামী হবে। আর নম্রতা কঠোরতার উপর অগ্রগামী হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন বিশ্ব মানবতা এবং সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।"[২৫৪]

এটা আল্লাহ তাআলাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলে দিয়েছেন। আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন: ১/২৬০

[২৫৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৭১১৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৫১

[২৫৪] সুরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭

এ বিষয়টা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়, যদি আমরা তার ব্যক্তি জীবনের দিকে তাকাই। দেখা যায়, তিনি সাহাবায়ে কেরাম এবং তার শত্রু-মিত্র সবার সাথেই দয়ার আচরণ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার উম্মতকেও এই মূল্যবান গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন- "যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন না।"[২৫৫]

হাদীসের মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রতি দয়া করার কথা বলা হয়েছে। এখানে কোনো জাতি বা ধর্মের কথা বিবেচনা করা হয়নি। এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন- "এই হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক। এখানে শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ- সবাই অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সবাইকেই দয়া করতে হবে।"[২৫৬]

আল্লামা ইবনে বাত্তাল[২৫৭] রহঃ বলেন- "এই হাদীসের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুসলমান, কাফের, পশু-পাখি, গোলাম-স্বাধীন- সবার প্রতিই দয়া করতে হবে। আর দয়া মানে- তাদেরকে খাওয়ানো, পান করানো, তাদের বোঝা হালকা করা এবং তাদেরকে কোনো রকম প্রহার না করা ইত্যাদি।"[২৫৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কসম খেয়ে বলেন- "ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান। আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র দয়ালু ব্যক্তির উপরই দয়া করেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! আমরা প্রত্যেকেই তো দয়া করি। তিনি বললেন- তোমাদের একজন আরেকজনের উপর দয়া করলে হবে না শুধু, বরং সকল মানুষকেই দয়া করতে হবে।"[২৫৯]

সুতরাং একজন মুসলমানকে শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, মুসলিম, অমুসলিম- নির্বিশেষে সকল মানুষের উপরই দয়া করতে হবে।

---

[২৫৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৬৯৪১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩১৯
[২৫৬] আল মিনহায৭৭/১৫
[২৫৭] আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহঃ। তার পুরা নামঃ আলী ইবনে খালফ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে বাত্তাল। তিনি ইবনুল লিজাম নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন ইলম, মারেফত, বুঝ, সুন্দর হাতের লেখা এবং প্রচুর মেধার অধিকারী। তিনি কয়েক খণ্ডে সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। ৪৪৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (আল আ'লাম:৪/৮৫ সিয়ারু আলামিন নুবালা:১৮/৪৭)
[২৫৮] তুহফাতুল আহওয়াযী:৬/৪২
[২৫৯] মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদীস নং-৪২৫৮শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-১১০৬০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– "তোমরা দুনিয়াবাসীর উপর দয়া করো। তাহলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন।"[২৬০]

এখানেও দুনিয়াবাসী দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে।

মুসলিম সমাজের এই দয়া-মায়াটা হলো এমন একটি ব্যবহারিক নৈতিক মূল্যবোধ, যা একজন মানুষকে আরেকজন মানুষের সাথে সদা দয়ার প্রতি আহ্বান জানায়। এমনকি বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ থেকে শুরু করে অবলা প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গের প্রতিও দয়া করতে বলা হয়েছে। এক মহিলা একটি বিড়ালের প্রতি দয়া না করে তার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার কারণে জাহান্নামী হয়ে গেছে। তার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "এক মহিলা জাহান্নামে গিয়েছিলো এই কারণে যে, সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিলো। তাকে কোনো খাবার-পানি দিতো না। আবার বিড়ালটি ছেড়েও দিতো না। ছাড়লে হয়তো সে জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারতো।"[২৬১]

পক্ষান্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক ব্যক্তির কথা বলেন, যাকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছিলেন এই জন্য যে, সে তৃষ্ণার্ত একটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছিলো। তিনি বলেন– "এক লোক রাস্তায় চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে একটি কূপে নেমে পানি পান করলো। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেলো, একটি কুকুর হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে সে মাটি চাটছে। লোকটি ভাবলো, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামলো। এরপর নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে ধরে উপরে উঠে আসলো এবং কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসুল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন– প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।"[২৬২]

---

[২৬০] জামে তিমিযী, হাদীস নং- -১৯২৪ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৪৯৪

[২৬১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩১৪০

[২৬২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২২৩৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে এই ঘটনাও শুনিয়েছেন যে, এক ব্যভিচারিণী মহিলার জন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়েছে তার অন্তরে কুকুরের মত একটি প্রাণীর প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়ার কারণে। তিনি বলেন– "একটি কুকুর পিপাসার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক কূপের পাশ দিয়ে ঘুরছিলো। বনী ইসরাঈলের এক ব্যভিচারিণী মহিলা এই অবস্থা দেখে তার মোজা খুলে সেটা দিয়ে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরকে পান করালো। আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিলেন।"[২৬৩]

মানুষ ভেবে অবাক হয়, একটি কুকুরের মাধ্যমে ব্যভিচারের অপরাধ থেকেও মুক্তি পেয়ে গেলো!? কিন্তু এখানে আসল রহস্যটা তো হলো– আন্তরিক দয়া-মায়া; যার মাধ্যমে মানুষ অনেক ভালো ভালো কাজ করতে সক্ষম হয় এবং মানবসমাজে বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে অশেষ মর্যাদা লাভ করতে পারে।

অবলা প্রাণী এবং ক্ষুদ্র পাখির প্রতি দয়াঃ

ইসলামে যে দয়া-মায়ার কথা বলা হয়েছে, এটা শুধু মানুষের প্রতিই না; বরং অবলা প্রাণীর প্রতিও দয়া করতে হবে। তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখা যাবে না এবং তাদের পিঠে সাধ্যাতীত বোঝা দেয়া যাবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দুর্বল উটের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন– "এসব অবলা পশুর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তাআলকে ভয় করো। সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহণ করো এবং তাদেরকে ভালোভাবে আহার করাও।"[২৬৪]

এক ব্যক্তি বললো- "হে আল্লাহর রাসুল! আমি বকরি জবাই করার সময়ও কি তার প্রতি দয়া করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– যদি তুমি বকরির উপর দয়া করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার উপর দয়া করবেন।"[২৬৫]

ইসলাম বড় প্রাণীদেরকে তো দয়া করতে বলেছেই, সাথে সাথে ঐ সমস্ত ছোট ছোট পাখিদের প্রতিও দয়া করতে বলেছে, যেগুলো বড় প্রাণীর মত মানুষের তেমন উল্লেখযোগ্য কাজে আসে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ছোট পাখি দেখে বললেন– "যে ব্যক্তি কোনো ছোট পাখিকে

---

[২৬৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩২৮০
[২৬৪] ১৭৬৬২ সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৫৪৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-
[২৬৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৬৩০

অযথা হত্যা করলো, কিয়ামতের দিন তা আল্লাহ তাআলার কাছে উচ্চ স্বরে ফরিয়াদ করে বলবে- হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমাকে অযথা হত্যা করেছিলো। সে কোনো উপকারার্থে আমাকে হত্যা করেনি।"[২৬৬]

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন– মিশর বিজয়ের সময় হযরত আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহুর তাবুর কাছে একটি কবুতর নামলো এবং তাবুর উপর বাসা বানালো। হযরত আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি এই পাখির বাসাটা দেখলেন। তিনি আর এই বাসাটা ধ্বংস করলেন না। তাবুসহ এভাবেই রেখে গেলেন। পরে এর আশপাশে আরও পাখির বাসা হতে হতে একসময় ঐ তাবুটা একটা পাখির নগরে পরিণত হলো।

হযরত ইবনে আবুল হাকাম হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাজিয়াল্লাহু আনহুএর জীবনীতে লেখেন– হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাজিয়াল্লাহু আনহু বিনা প্রয়োজনে ঘোড়াকে পদাঘাত করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি ঘোড়ার মালিকদের নিকট চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যাতে ভারী শিকল দ্বারা ঘোড়াকে না বাঁধে। আর এমন চাবুক দ্বারা খোঁচা না দেয়, যার নিচে লোহার পাত লাগানো থাকে। তিনি মিশরের গভর্নরদের নিকট চিঠি লিখে বলেন– "আমার নিকট খবর এসেছে যে, মিশরে বোঝাবাহী উটের উপর এক হাজার রিতল ওজনের বোঝা দেয়া হয়। তোমাদের কাছে আমার এই চিঠি পৌছার পর থেকে কেউ যেনো ছয়শ' রিতিলের[২৬৭] বেশি ওজনের বোঝা উটের পিঠে না দেয়।"[২৬৮]

এই হলো ইসলামী সমাজে দয়া-মায়ার চিত্র। যখন সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে দয়া থাকবে, তখন দেখা যাবে- তারা দুর্বলদের সাহায্য করছে। দু:খীদের ব্যথায় ব্যথিত হচ্ছে। অসুস্থদের সেবা করছে। অভাবীদের অভাব পূরণের চেষ্টা করছে। যদিও এগুলো হয় বোবা প্রাণী বা পশু-পাখি।

---

[২৬৬] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং- -৪৪৪৬ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৯৪৮৮

[২৬৭] ৮ রিতল= ১ সা'। ১ সা'= ৩.৩৩০ কেজি। ১ রিতল= (৩.৩৩০/৮) ০.৪২ কেজি। সুতরাং ৬০০ রিতল= (৬০০*০.৪২) ২৫২ কেজি। যা বর্তমান মণ হিসেবে হয় (২৫২/৩৭.৩২) ৬.৭৫ মণ। (অনুবাদক)

[২৬৮] সীরাতু উমর ইবনে আব্দুল আযীয:১/১৪১

এসব হৃদয়বান দয়ালু মানুষগুলোর মাধ্যমেই সমাজ সুন্দর হয়। অন্যায় দূর হয়। চারিদিকে শান্তি, সাম্য আর কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামে মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক

ভূমিকাঃ

একটি মুসলিম রাষ্ট্রে কিভাবে মুসলিম এবং অমুসলিমরা শৃঙ্খলা বজায় রেখে থাকতে পারে, ইসলামী সভ্যতা শুধু এই নীতিমালা বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলিমরা কিভাবে অমুসলিম সম্প্রদায় এবং বহির্বিশ্বের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে, এই বিষয়টিও অনেক গুরুত্বসহ আমলে নিয়েছে ইসলাম। এজন্য ইসলাম এমন এমন নীতিমালা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা সম্ভব হয়। এর দ্বারা ইসলামী সভ্যতার মাহাত্ম্য এবং উদার মানবতা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

ইসলাম শান্তির ধর্মঃ

শান্তিই হলো ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র। যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে; অর্থাৎ যারা পরিপূর্ণ মুসলমান, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[২৬৯]

উক্ত আয়াতে ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– শান্তি। এটা এমন এক শান্তির ধর্ম, যদি কারও জীবনে তা থাকে, তাহলে তার জীবনে শান্তি। যদি কোনো ঘরে থাকে, তাহলে ঐ ঘরে শান্তি। যদি কোনো সমাজে থাকে, তাহলে ঐ সমাজে শান্তি। যদি কোনো রাষ্ট্রে থাকে, তাহলে ঐ রাষ্ট্রে শান্তি। এর নামই হলো ইসলাম।

ইসলাম ধর্ম যে শান্তির ধর্ম, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয়। কেননা, আমরা দেখি– আরবীতে اسلام (ইসলাম) শব্দটির মূল উৎস হলো سلم (সিলমুন)– যার অর্থ– শান্তি। আর শান্তি হলো ইসলামের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যদি শান্তিকে

---

[২৬৯] সুরা বাকারাহ, আয়াত নং-২০৮

ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নাও মানা হয়, তবুও শাব্দিক অর্থে ইসলামের মূল অর্থই হলো– শান্তি।[২৭০]

সুতরাং শান্তি হলো ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র। যা একটা মানুষকে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা, সদ্ব্যবহার এবং সমাজে শৃঙ্খলা আর পরোপকারে উদ্বুদ্ধ করে। অমুসলিমরা যখন কোনো বিশৃঙ্খলা না করে শান্তশিষ্টভাবে থাকে, তখন ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম-অমুসলিম সবাই ভাই ভাই।[২৭১]

মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে। শান্তির জন্য আলাদা কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই। যতদিন পর্যন্ত অমুসলিমরা মুসলমানদের সাথে কোনো ধরণের শত্রুতায় লিপ্ত না হবে, ততোদিন পর্যন্ত তারা কোনো রকম চুক্তি ছাড়াই শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।[২৭২]

অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কঃ

ইসলাম ধর্মে সমস্ত মুসলমানদের উপর এটা ওয়াজিব বা আবশ্যক যে, তারা অন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অমুসলিমদের সাথে ভালোবাসা ও মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখবে। এই মানবতাপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে মানবসকল! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও।"[২৭৩]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়– "পরস্পর বিচ্ছিন্নতা-বিভক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জাতি-গোত্র ভাগ করেননি। বরং তাদের পরস্পর পরিচিতি, ভালোবাসা আর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্যই এই বিভক্তি।"[২৭৪]

এই আয়াতটি আরও স্পষ্ট হয় পবিত্র কুরআনের ঐ সকল আয়াত দ্বারা, যেখানে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে– যদি কাফেররা তোমাদের সাথে শান্তিচুক্তি বা সন্ধিতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের সাথে মিলেমিশে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করো। আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ

---

[২৭০] আল ইসলামু ওয়াল আলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহঃ১০৬
[২৭১] আল ইসলামু আকীদাতুহু ওয়া শরিয়াতুহুঃ৪৫৩
[২৭২] আন নাযামুল ইসলামিয়্যাহ নাশআতুহা ওয়া তাত্বায়্যুরুহাঃ৫২০
[২৭৩] সূরা হুজুরাত, আয়াত নং-১৩
[২৭৪] জাআল হাক্বঃ১৮ (মাজাল্লাতুল আযহার, ডিসেম্বরঃ১৯৯৩)

প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সেদিকেই আগ্রহী হও। আর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করো।"[২৭৫]

এই আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের ভালোবাসা এবং যুদ্ধাবস্থায় তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করে উভয় পক্ষে শান্তি বজায় রাখার পথ নির্দেশ করে। সুতরাং শত্রুপক্ষ যখন শান্তিচুক্তিতে আগ্রহ দেখাবে, তখন এতে যদি মুসলমানদের কোনো রকম ক্ষতির আশংকা না থাকে এবং কোনো ধরনের অধিকার নষ্ট না হয়, তাহলে তারা এই শান্তিচুক্তির আহ্বানে সাড়া দিবে।

ইমাম ছুদ্দী[২৭৬] এবং ইবনে যায়েদ[২৭৭] রহঃ বলেন– "এই আয়াতের অর্থ হলো– যদি তারা তোমাকে সন্ধির আহ্বান করে, তাহলে তুমি তাতে সাড়া দাও।"[২৭৮]

এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে– যাতে তারা সর্বদা শান্তি বজায় রাখে। এমনকি শত্রুপক্ষ যদি উপরে উপরে শান্তির বাণী বলে আর ভেতরে ভেতরে শত্রুতা পোষণ করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্ভয় দিয়ে বলেন– "পক্ষান্তরে তারা যদি তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে আর মুসলমানদের মাধ্যমে।"[২৭৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই তোমাকে হেফাজত এবং সুরক্ষা দান করবেন।[২৮০]

---

[২৭৫] সুরা আনফাল, আয়াত নং-৬১

[২৭৬] তার নাম– ইসমাঈল ইবনে আব্দুর রহমান আছ-ছুদ্দী। তিনি ছিলেন একজন তাবেঈ। হিজাজে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কুফাতেই বসবাস করেন। তিনি ছিলেন তাফসীর, মাগাযী এবং সিরাত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি স্বীয় যমানার ইমাম ছিলেন এবং সমসাময়িক অবস্থা মানুষের রীতি-নীতি সম্পর্কে খুব ভালো খোজ-খবর রাখতেন। তিনি ১২৮ হিজরি মোতাবেক ৭৪৫ ইংরেজিতে মৃত্যুবরণ করেন। আন নুজুমুয যাহিরাহঃ ১/৩৯০

[২৭৭] তার নাম– আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম। তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং মুফাসসির। তার অন্যতম প্রসিদ্ধ কিতাব হলো- 'আন নাসেখ ওয়াল মানসুখ' এবং 'আত-তাফসীর'। তিনি বাদশাহ হারুনুর রশীদের খেলাফতামলে ১৭০ হিজরি মোতাবেক ৭৮৬ ইংরেজিতে মৃত্যুবরণ করেন। আল ফিহরিসত লি ইবনি নাদীমঃ ১/৩১৫

[২৭৮] তাফসীরে কুরতুবী:৩৯৯-৩৯৮/৪ :

[২৭৯] সুরা আনফাল, আয়াত নং-৬২

[২৮০] তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৪০০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সকল কাজে শান্তির কথা বিবেচনা করে তাদেরকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন এবং সর্বদা শান্তিতে থাকার জন্য দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দুআর মধ্যে বলতেন– اللهم اني أسئلك العافية في الدنيا والأخرة (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা চাই)।[২৮১]

একবার তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বক্তৃতাদানকালে বলেন– "তোমরা শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎ কামনা করো না। বরং তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। আর যখন তোমরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তোমরা ধৈর্যের পরিচয় দাও।"[২৮২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হারব (যুদ্ধ) শব্দটাও অপছন্দ ছিলো। তিনি বলেন– "আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম- আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ। সবচেয়ে বিশ্বস্ত নাম- হারেস ও হাম্মাম। আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম হলো- হারব ও মুররাহ।"[২৮৩]

[২৮১] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৫০৭৪
[২৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৮০৪
[২৮৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৪৯৫০

মুসলিম-অমুসলিম সন্ধি-চুক্তি

ভূমিকাঃ

মুসলমানদের সাথে অমুসলিমদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সন্ধি-চুক্তির বিধান ইসলামে আছে। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হয়। আর মুসলিম-অমুসলিম এক ছায়াতলে এসে জমা হয়। মুসলমানদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্কের মূল উদ্দেশ্য হলো– সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা। এজন্য চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ীভাবে শান্তিচুক্তি করা হয়ে থাকে। অথবা এমন মজবুত স্থায়ী শান্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যাতে চুক্তি বহাল থাকা পর্যন্ত নতুন করে আর কোনো শত্রুতা তৈরি না হয় এবং দু'পক্ষই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পারে।[২৮৪]

যুগযুগ ধরে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন সন্ধি-চুক্তি করে আসছে। এসব চুক্তির মাঝে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী থাকে। কিন্তু শর্তগুলো অনেক সময় পুরোপুরি ইসলামী আইন অনুযায়ী হয় না। এজন্য চুক্তির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসে না।

সন্ধি বা চুক্তি কাকে বলে?

সন্ধি বা চুক্তি হলো– এমন কিছু প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা বা শপথ অথবা ওয়াদা, যা যুদ্ধকালীন বা শান্তিকালীন সময়ে কোনো মুসলিম দেশ অমুসলিম দেশের সাথে করে থাকে। সাধারণত যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধ বিরতি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার চুক্তিকে সন্ধি বলা হয়ে থাকে।

মুসলমানদেরকে যুদ্ধ বিরতি দিয়ে সন্ধি-চুক্তি করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন– "যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তোমরা তাদের আহ্বানে সাড়া দাও।"[২৮৫]

---

[২৮৪] আল আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম: ৭৯

[২৮৫] সুরা আনফাল, আয়াত নং-৬১

ইসলামে সন্ধি-চুক্তির কিছু নমুনাঃ

মদীনার ইহুদীদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধিঃ-

অমুসলিমদের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের যেসকল সন্ধি হয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম সন্ধি হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় আগমনের পর মদীনার ইহুদীদের সাথে সন্ধি। এ সন্ধিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– "ইহুদীরা মুসলমানদের সাথেই বসবাস করতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমানদের সাথে কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বনী আওফের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একই উম্মত বলে গন্য হবে। ইহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে। মুসলমানরা মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে।

তারা নিজেরা এবং তাদের মিত্ররাও এই অধিকার ভোগ করবে। তবে যে জুলুম করবে এবং কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে, সে তার নিজের এবং পরিবারের শুধু ধ্বংসই ডেকে আনবে।

বনু নাজ্জার, বনু হারেস, বনু সায়েদাহ, বনু জুশাম, বনু আউস এবং বনু শাতিবাহ'র ইহুদীরাও বনু আওফের ইহুদীদের মত সব অধিকার ভোগ করবে।

ইহুদীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোও তাদের জীবনের মতই সম্মানযোগ্য। ইহুদীদের ব্যয়ভার ইহুদীরাই বহন করবে। আর মুসলমানদের ব্যয়ভার মুসলমানদেরই বহন করতে হবে। কারও কোনো শরীক যুদ্ধরত থাকলে তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করতে হবে। আর পরস্পরের মাঝে কল্যাণকামনা, সদুপোদেশ ও মহানুভবতার সম্পর্ক থাকবে। কোনো অন্যায় কাজে একে অপরের শরীক হবে না। কেউ তার মিত্রের কোনো ধরণের ক্ষতি সাধন করবে না। মজলুমদের সাহায্য করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

প্রতিবেশি যদি অপরাধী না হয় এবং কোনো ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত না হয়, তাহলে তার জান, মাল ও ইজ্জত নিজের জান, মাল ও ইজ্জতের মতই পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকারী। এই সন্ধির অন্তর্ভূক্ত যারা আছে, তাদের মাঝে যেকোনো ধরণের ঝগড়া-বিবাদ ঘটুক না কেনো, এর ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের শরণাপন্ন হতে হবে। মদীনায় কেউ আক্রমণ করতে এলে এই সন্ধির অন্তর্ভূক্ত সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করবে। যখন সন্ধি ও মৈত্রী

স্থাপনের আহ্বান জানানো হবে, তখন তারা আহ্বানকারীদের সাথে সন্ধি করবে।

এ ধরণের সন্ধি যখন মুসলমানদের সাথে করা হবে, তখন মুসলমানদেরকেও এসব সন্ধি মেনে চলতে হবে। যারা ধর্মের বিরুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের সাথে কোনো সন্ধি নেই। সাধারণ মানুষ যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তখন তারা তাদের প্রাপ্য অংশ ঐ পক্ষের কাছ থেকে নিবে, যাদের পক্ষ থেকে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

আল্লাহ তাআলা এই সন্ধির আনুগত্যের ব্যাপারে সর্বাধিক সততা ও সত্যবাদিতা দেখতে চান। এই সন্ধিপত্র কোনো অত্যাচারী বা অপরাধীর জন্য রক্ষাকবচ নয়। আর জুলুম কিংবা অপরাধে লিপ্ত না হলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকও মদীনার সীমানার ভেতরে নিরাপত্তা লাভ করবে।"[২৮৬]

এটা স্পষ্ট যে, এই সন্ধিনামার মাধ্যমে মুসলমান ও ইহুদীদের মাঝে পূর্ণ শান্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিলো। এটাও স্পষ্ট হয় যে, এই সন্ধির মাধ্যমে সবার মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছিলো।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো– এই সন্ধিনামায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'সবাই মজলুমদের সাহায্য করবে।' এটা ছিলো সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্বলদের সাহায্য নিশ্চিত করার জন্য এক যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ সন্ধিনামা।[২৮৭]

নাজরানের খৃস্টানদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধিঃ-

সীরাতের কিতাবগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধি করার অনেকগুলো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

---

[২৮৬] সীরাতুন্নাবাবিয়্যাহ, ইবনে কাসীরঃ -৩২৩-৩২২/২ সীরাতে ইবনে হিশামঃ৫০৪-৫০৩/১
[২৮৭] আল আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলামঃ৮১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের খৃস্টানদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে– "নাজরান ও তার আশপাশের অধিবাসীদের জান, মাল, ধর্ম, জমিন, পরিবার, বংশ এবং তাদের অধীন কমবেশি সবকিছুই আল্লাহ ও তার রাসুলের জিম্মাদারিতে ছিলো।"[২৮৮]

বনু জুমরার সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধিঃ-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু জুমরার সাথে সন্ধি করেছিলেন। তাদের সর্দার ছিলো- মাখশি' ইবনে আমর আজ-জমীরী।

তিনি বনু মুদাল্লাজের সাথেও সন্ধি করেছিলেন। যারা ইয়ামবি' অঞ্চলে বাস করতো। এটা ছিলো দ্বিতীয় হিজরির জুমাদাল উলা মাসে।

তিনি আরও সন্ধি করেছিলেন জুহাইনার বিভিন্ন গোত্রের সাথে। যারা মদীনার উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতো।[২৮৯]

উমরী সন্ধিঃ-

ইসলামী সন্ধিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সন্ধি হলো– ইলিয়া (বাইতুল মাকদিস) এর অধিবাসীদের সাথে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহুর সন্ধি। ইতিহাসের ভাষায় এটাকে বলা হয়- উমরী সন্ধি।[২৯০]

ইসলামের এসব সন্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মুসলমানগণ সর্বদা তাদের প্রতিবেশিদের সাথে শান্তি, নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলময় পরিবেশ বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেছেন। শুধু শুধু অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েননি; বরং সর্বদা যুদ্ধের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন শান্তিকে, আর বিবাদ-বিচ্ছেদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ঐক্যকে।

ইসলামে সন্ধির বিভিন্ন শর্ত এবং নীতিমালাঃ

সন্ধির জন্য ইসলাম কিছু শর্ত এবং নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছে। যার মাধ্যমে সন্ধিটা শরিয়তসম্মত হয় এবং সন্ধির আসল লক্ষ্যে পৌছা সহজ হয়।

---

[২৮৮] দালায়েলুন নবুওয়াহ:৫/৪৮৫ আল খিরাজ:৭২
[২৮৯] সীরাতে ইবনে হিশাম:৩/১৪৩ আত তাবাকাতুল কুবরা:১/২৭২
[২৯০] তারীখে তাবারী:২/৪৪৯-৪৫০

শাইখ মাহমুদ শালতুত[২৯১] রহঃ বলেন– ইসলাম মুসলমানদেরকে যে সন্ধি করার অধিকার দিয়েছে, এই সন্ধি সহীহ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত মানতে হবে।

এক. সন্ধির শর্তগুলো কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাধারণ আইন এবং শরিয়তের কোনো আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো– "যেসকল শর্ত আল্লাহ তাআলার কিতাবের বিপরীত, সেগুলো বাতিল।"[২৯২]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যেসব শর্তকে মেনে নেয় না বরং প্রত্যাখ্যান করে, সন্ধিতে সেসব শর্ত থাকতে পারবে না।

এই শর্তের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম এমন কোনো সন্ধিকে স্বীকৃতি দেয় না, যেখানে কোনো একক ব্যক্তির প্রভাব থাকে। কেননা, এর মাধ্যমে মুসলিম জামাতের উপর শত্রুবাহিনীর আক্রমণের দ্বার উন্মুক্ত হয় অথবা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে একেবারে দুর্বল করে দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

দুই. সন্ধিটি দুই পক্ষের সম্মতিতেই হতে হবে। সুতরাং যেসব সন্ধি নির্যাতন, নিপীড়ন এবং জবরদস্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইসলামে এসব সন্ধি গ্রহণযোগ্য নয়। যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে এটা একটা স্বভাবজাত বিষয়। কোনো বস্তু বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রেও দু'জনের সন্তুষ্টি ছাড়া সে চুক্তি বৈধ হয় না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– "কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ।"[২৯৩]

আর সন্ধি তো হলো মানুষের জীবন-মরনের প্রশ্ন। এখানে কেনো পরস্পরের সন্তুষ্টির শর্ত করা হবে না!

---

[২৯১] শাইখ মাহমুদ শালতুত রহঃ। ১৩১০ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৩ ইংরেজিতে মিশরের বাহিরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মিশরের একজন প্রখ্যাত ফকীহ এবং মুফাসসির। তিনি মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে সেখানেই শরীয়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ ইংরেজিতে আল আযহারের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। তিনি ১৩৮৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৩ ইংরেজিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২৯২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৫৮৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৫০৪

[২৯৩] সুরা নিসা, আয়াত নং-২৯

তিন. সন্ধির প্রতিটি বিষয় হতে হবে অত্যন্ত স্পষ্ট। যেখানে প্রতিটি নীতিমালা, অধিকার এবং কর্তব্য ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট উল্লেখ করা থাকবে। যাতে সেখানে কোনো অপব্যাখ্যা, দূরভিসন্ধি বা খেল-তামাশার কোনো রকম সুযোগ না থাকে। বিভিন্ন সভ্য জাতি– যারা শান্তি ও মানবাধিকারের দাবি করে, তাদের বহু সন্ধি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো এবং এর মাধ্যমে বৈশ্বিক বিপর্যয় ঘটেছিলো। আর তাদের এই ব্যর্থতার কারণ ছিলো– অস্পষ্ট সন্ধিনামা। তাদের সন্ধির মধ্যে প্রতিটি বিষয় খুব ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট বলা হয়নি। এজন্য সন্ধির ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন– "তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্বের বাহানা বানিয়ো না। তাহলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার পা ফসকে যাবে। আর তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধা দান করেছো।"[২৯৪]

এখানে 'বাহানা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ধোকা ও অস্পষ্টতা। যা কোনো কিছুতে থাকলে সেটাকে নষ্ট করে দেয়।

সন্ধি পূরণের বাধ্যকতাঃ

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বহু হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, সন্ধি পূরণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহকে পূর্ণ করো।"[২৯৫]

অপর এক আয়াতে এসেছে– "আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো।"[২৯৬]

তিনি আরও বলেন– "তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, কেননা, অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।"[২৯৭]

এছাড়াও আরও অনেক আয়াত আছে, যেখানে অঙ্গীকার পূর্ণ করতে বলা হয়েছে।

---

[২৯৪] সুরাতু নাহল, আয়াত নং-৯৪
[২৯৫] সুরা মাইদাহ, আয়াত নং-১
[২৯৬] সুরা আনআম, আয়াত নং-১৫২
[২৯৭] সুরা বানী ইসরাঈল, আয়াত নং-৩৪

এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমররাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

১. যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে।

২. যে অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে।

৩. যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

৪. যে কথায় কথায় ঝগড়া ও গালাগালি করে।

যার মধ্যে এ চারটির কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফেকির একটি স্বভাব পাওয়া গেলো। যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে।"[২৯৮]

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা[২৯৯] হবে।"[৩০০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– "যদি কারও সাথে কোনো কওমের সন্ধি থাকে, তাহলে সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা নবায়ন করে শক্তিশালী করা যাবে না। আবার ভঙ্গও করা যাবে না। যখন সন্ধির মেয়াদ শেষ হবে, তখন ঘোষণা দিয়ে তা শেষ করতে হবে।"[৩০১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন– "সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির উপর জুলুম করবে, বা তার প্রাপ্য কম দিবে, কিংবা তার সামর্থের বাইরে তাকে কিছু করতে বাধ্য করবে, অথবা

---

[২৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩০০৭

[২৯৯] অর্থাৎ তার সাথে গাদ্দারির এমন আলামত থাকবে, যার দ্বারা সবাই সহজে চিনতে পারবে এই লোক গাদ্দার। (শরহু মুসলিম লিন নববী:৪/৪৬) -অনুবাদক

[৩০০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -৩০১৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩৫

[৩০১] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-২৭৫৯

সন্তুষ্টিমূলক সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে নিবে; কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো।"[৩০২]

ফুকাহায়ে কেরাম তথা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ– যারা নেককার এবং ফাসেক আমীরদের সাথে জিহাদ করাকে জায়েয মনে করতেন, তাদেরই অধিকাংশের মত হলো– "যে আমীর অঙ্গীকার ঠিক রাখে না এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করে না, তার সাথে জিহাদে যাওয়া জায়েয নেই।"

সময়ের পরিবর্তনের কারণে চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ হয়ে যায় না। এমনকি যদি মুসলমানরা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবুও অপর পক্ষের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। মুসলিম আমীর হযরত উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন হিমসের গভর্নর হলেন, তখন তিনি সেখানকার অধিবাসীদের থেকে জিযিয়া নিলেন। এরপর একসময় এসে তিনি জিযিয়া নেয়া বন্ধ করে দিলেন এবং যাদের কাছ থেকে জিযিয়া নিয়েছিলেন, তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন–

আমরা তোমাদের সম্পদ তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম। কেননা, আমাদের জন্য যা আসার কথা ছিলো, তা এসে পৌঁছেছে। আর তোমরা আমাদের সাথে শর্ত করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করবো, এখন এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তোমাদের নিকট থেকে যা নিয়েছিলাম, তা আমরা তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দিলাম। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে চুক্তিনামা লেখা হয়েছে, আমরা তার উপরই বহাল আছি। যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন।[৩০৩]

ইসলামী ইতিহাসে এ জতীয় আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং জাতীয় স্বার্থ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোনো সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে মুসলমানদেরও দ্বিতীয় পক্ষের তুলনায় নিজেদেরকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা ঠিক নয়। এ বিষয়টি নিশ্চিত করেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "আল্লাহর নামে অঙ্গীকার

---

[৩০২] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-৩০৫২
[৩০৩] আল খিরাজ:৮১

করার পর তোমরা সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো। এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না। কারণ, তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে জামিন রেখেছো। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সব জানেন।"[৩০৪]

এখানে এমন এক পরিবেশে এবং এমন এক সময়ে মুসলমানদেরকে সন্ধি পূরণ করার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে, নিয়মানুযায়ী যেখানে সন্ধি পূরণ না করলেও চলে।

ইসলামী রাষ্ট্রগুলো অনৈসলামিক রাষ্ট্রের সাথে যেসব চুক্তি করবে, সেক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম হলো– মুসলমানরা কোনো চুক্তি ভঙ্গ করবে না; বরং তা পুরোপুরিভাবে পালন করবে এবং সর্বাবস্থায় চুক্তি রক্ষা করে চলবে। যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ তা ভঙ্গ না করে। সুতরাং যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে এবং মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো বৈরিতা না থাকে, তাহলে মুসলমানদের চুক্তি রক্ষা করে চলতে হবে। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "তবে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ। অতপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো।"[৩০৫]

শাইখ মাহমুদ শালতুত রহঃ বলেন– "চুক্তি পূরণ করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। কেননা, একজন মুসলমান আল্লাহ্ তাআলার সামনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। এটা লঙ্ঘন করা ধোঁকা এবং বিশ্বাসঘাতকতা।"[৩০৬]

এভাবে আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি-নীতিমালার মধ্যে ইসলামী চুক্তি-নীতিমালার অবস্থান অন্যান্য সকল নীতিমালার উপরে। আর এর মাধ্যমে শত্রুদের সাথে ইসলামের ন্যায়বিচার, উদারতা ও শুদ্ধতা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে সর্বাগ্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো– ইসলাম শুধু এক্ষেত্রে নীতিমালাই তৈরি করেনি; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানা, খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানা এবং পরবর্তীতে ইসলামী খেলাফতের যমানায় অমুসলিমদের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তি করে এসব নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগও ইসলামী ইতিহাসে রয়েছে।

---

[৩০৪] সুরাতু নাহল, আয়াত নং-৯১
[৩০৫] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-৪
[৩০৬] আল ইসলামু আকীদাতুহু ওয়া শরিয়াতুহু:৪৫৭

ইসলামে দূতের নিরাপত্তাঃ

দূতের নিরাপত্তার বিষয়ে ইসলামী শরিয়তে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো দূতকে হত্যা করা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম মুসলিম শাসকদেরকেও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন- "যাতে তারা দূতদেরকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে, তাদেরকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করে এবং তাদেরকে স্বাধীনভাবে আপন দায়িত্ব পালন করতে দেয়।"[৩০৭]

"ইসলামে দূতদের পরিপূর্ণ সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে। বন্দীদের মত তাদেরকে গ্রেফতার করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে দূতকে তার রাষ্ট্রের কাছে সোপর্দ করাও বৈধ নয়, যদি রাষ্ট্র তাকে তলব করে, আর সে যেতে অস্বীকার করে; এমনকি যদি দারুল ইসলামকে যুদ্ধের হুমকিও দেয়া হয়। কেননা, এই দূত দারুল ইসলামে পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করবে। এটা তার অধিকার। যদি তাকে সোপর্দ করে দেয়া হয়, তাহলে এটা গাদ্দারী হবে।"[৩০৮]

দুই দেশের মাঝে সন্ধি, বন্ধুত্ব এবং যুদ্ধবিরতিতে দূতরা বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য তাদের সকল পথ খুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়া উচিৎ। এটা তার একক ব্যক্তির জন্য নয়; বরং তার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য। কেননা, দূতের কাছ থেকে ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে দূত প্রেরক অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন না। এজন্য যাদের কাছে দূত পাঠানো হয়, তাদেরকে বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

হযরত আবু রাফে' রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "মক্কার কুরাইশরা আমাকে দূত হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠালো। আমি তাকে দেখামাত্রই আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রচণ্ড আগ্রহ জাগলো। আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! আমি আর কখনও তাদের কাছে ফিরে যাবো না। তিনি বললেন– আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না। দূতকে আটকে রাখি

---

[৩০৭] আল মুহাল্লা: ৪/৩০৭

[৩০৮] আশ শরিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল কানুনুদ দুওয়ালিল আম:১২৯

না। তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। আর তোমার অন্তরে যদি এখনকার মত ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ বাকি থাকে, তাহলে পরে আবার এসো।"[৩০৯]

ইমাম হাইছামী[৩১০] রহ: তার প্রসিদ্ধ কিতাব– 'মাজমাউজ জাওয়ায়েদে' এ জাতীয় হাদীসসমূহ নিয়ে একটি আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। যার নাম দিয়েছেন–'দূত হত্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা'।

সেখানে তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু ইবনে নাওয়াহার মৃত্যুর সময় বলেন, এই ব্যক্তি এবং ইবনে উছাল– তারা দুইজন মুসাইলামা কাযযাবের দূত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন– তোমরা কি এটা সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসুল? তারা বললো- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুসাইলামা আল্লাহর রাসুল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি যদি দূতদেরকে হত্যা করতাম, তাহলে এখন তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।"[৩১১]

ইমাম হাইছামী রহ: বলেন– "এরপর এটা আইনে পরিণত হলো– "দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না"।[৩১২]

এভাবেই চৌদ্দশত বছরের অধিক সময় ধরে ইসলামী সভ্যতা দূতের নিরাপত্তা ও মানবতাবাদী অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতার আগে রয়েছে। অথচ ঐ সভ্য (?) সমাজ কিছুকাল আগ পর্যন্তও এসব নিয়মনীতিকে স্বীকৃতি দেয়নি।[৩১৩]

---

[৩০৯] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৭৫৮ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৩৯০৮

[৩১০] ইবনে হাজার আল হাইছামী রহ:। তার নাম– আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান শাফেয়ী মিসরী। তিনি ৭৩৫ হিজরি মোতাবেক ১৩৩৫ ইংরেজিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। তার প্রসিদ্ধ কিতার- 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়েদ'। তিনি ৮০৭ হিজরি মোতাবেক ১৪০৫ ইংরেজিতে মৃত্যুবণ করেন। (আল আ'লাম:২৬৬/৪)

[৩১১] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৭৬১ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৭০৮

[৩১২] মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং-৩৭৮/৫

[৩১৩] দাবলুমাসিয়াতুন নবী মুহাম্মাদ:১৭২

ইসলামে জিহাদ: কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামে জিহাদের হাকীকতঃ

ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে– 'ইসলামে শান্তিই হলো মূল'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের (জিহাদের) আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো।"[৩১৪]

সুতরাং একজন মুসলমান স্বভাবগতভাবেই পবিত্র কুরআন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ জীবন থেকে যে শিক্ষাটা গ্রহণ করে, সেটা হলো– 'অন্যায়ভাবে হত্যা এবং রক্তপ্রবাহকে ঘৃণা করা'। এজন্য মুসলমান কারও সাথে আগে বেড়ে লড়াই করে না; বরং রক্তপাত এড়ানোর জন্য সম্ভাব্য অন্য সকল পথেই তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। অন্য পথ খোলা থাকলে তারা আর জিহাদের দিকে অগ্রসর হয় না। পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মুসলমানদেরকে জিহাদের অনুমতি তখনই দেয়া হয়েছে, যখন শত্রুপক্ষ তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। কেননা, এ অবস্থায় নিজেদের জীবন এবং দ্বীন-ধর্ম বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে জিহাদ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই অবস্থায়ও যদি মুসলমান চুপ করে বসে থাকে, তাহলে এটা ভীরুতা আর নিজেদের জান, মাল এবং দ্বীনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া ছাড়া আর কিছুই না। আল্লাহ তাআলা বলেন– "জিহাদের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে। শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমার পালনকর্তা আল্লাহ।"[৩১৫]

---

[৩১৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৮০৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৪২

[৩১৫] সুরা হাজ্ব, আয়াত নং-৪০-৩৯

উক্ত আয়াতে জিহাদের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তা হলো– 'মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া'।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে জিহাদ করো, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৩১৬]

ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন– "এটি হলো জিহাদের আদেশ সম্বলিত সর্বপ্রথম আয়াত। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, হিজরতের পূর্বে জিহাদ সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ছিলো। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম ছিলো– "তাদের জবাবে শুধু উত্তম কথা বলুন।"[৩১৭] "আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ভুল-ত্রুটি মাফ করুন।"[৩১৮]

"মক্কায় থাকাবস্থায় এ জাতীয় আয়াতগুলোই অবতীর্ণ হয়েছে। পরে যখন মুসলমানগণ হিজরত করে মদীনায় গেলেন, তখন জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে।"[৩১৯]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো– প্রথমে জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে ঐ সকল লোকদের সাথে, যারা আগে যুদ্ধ করতে আসে। আর যারা শান্তি বজায় রেখে চুপচাপ বসে থাকে, কোনো রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে আসে না, তাদের সাথে কিন্তু ইসলাম জিহাদের হুকুম দেয়নি। এ বিষয়টিই স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না'। এরপর আবার মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন- 'আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকে পছন্দ করেন না। যদিও তা অমুসলিমদের সাথে হোক না কেনো। এর মাধ্যমে অনর্থক যুদ্ধের দরজা বন্ধ করে সমস্ত মানবতার প্রতি দয়া করা হয়েছে।

---

[৩১৬] সুরা বাকারাহ, আয়াত নং-১৯০
[৩১৭] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত নং-৩৪
[৩১৮] সুরা মাইদাহ, আয়াত নং-১৩
[৩১৯] তাফসীরে কুরতুবী:১/৭১৮

আল্লাহ তাআলা বলেন– "তোমরা সবাই মিলে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো, যেভাবে তারা সবাই মিলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে।"[৩২০]

ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন– "এখানেও জিহাদটা ব্যাপক না। যেহেতু মুশরিকরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করছে, তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন।"[৩২১]

উক্ত আয়াতে সকল মুশরিকদের সাথে জিহাদের হুকুম এজন্যই দেয়া হয়েছে, যেহেতু মুশরিকরা সবাই মিলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতো।

সুতরাং যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে না জড়াবে, তাদের সাথে জিহাদ করা জায়েয নেই। কারও সাথে জিহাদ করা তখনই জায়েয হয়, যখন তার দ্বারা যুদ্ধের কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়। যেমন কেউ মুসলমানদের অধিকার নষ্ট করে চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদিতে লিপ্ত হলো বা তারা কারও উপর অন্যায়-অনাচার এবং জুলুম শুরু করলো আর মুসলমানগণ এসব অবিচার ও জুলুম প্রতিরোধের ইচ্ছা করলো অথবা তারা মুসলমানদের দ্বীন-ধর্ম পালন করতে বাধা দিতে লাগলো বা অন্যের কাছে এই দ্বীন পৌছানোর ক্ষেত্রে তারা বাধা হয়ে দাড়ালো, তখন তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন– "তোমরা কি সেই দলের সাথে জিহাদ করবে না, যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসুলকে বহিষ্কারের সংকল্প করেছে? তারাই তো তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ তাআলা, যদি তোমরা মুমিন হও।"[৩২২]

এ আয়াতে শপথভঙ্গকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– 'মক্কার কাফেররা।' আর তাদের কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এজন্য আয়াতে তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– 'তারা রাসুলকে বের করার সংকল্প করেছে।'

---

[৩২০] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-৩৬

[৩২১] তাফসীরে কুরতুবী:৪৭৪/৪ :

[৩২২] সুরা তাওবাহ, আয়াত নং-১৩

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন– "তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থাকা চুক্তি ভঙ্গ করে তাকে মদীনা থেকে বের করেছিলো মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।"

হযরত হাসান বসরী রহঃ বলেন– "তারা আগে বিবাদের সূত্রপাত করেছে মানে- তারা আগে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করেছে।"

কেউ কেউ বলেন– "তারা বদরের দিন আগে যুদ্ধের সূচনা করেছে। কেননা, বদরের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়েছিলেন শুধু মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলাকে আটকানোর জন্য। যখন তিনি তাদেরকে আটকাতে পারলেন না, তখন কাফেরদের নিরাপদে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ ছিলো। কিন্তু তারা তা না করে বরং যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে বদরের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। এভাবে মুশরিকরাই আগে যুদ্ধের সূচনা করেছে।"

আবার কেউ কেউ বলেন– "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বহিষ্কারের অর্থ হলো- মক্কার কাফেররা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হজ, উমরা এবং তাওয়াফ করতে দেয়নি। এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সাথে আগে এসে যুদ্ধের সূচনা করেছে।"[৩২৩]

আয়াতের উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহ থেকে যে ব্যাখ্যাই মেনে নেই না কেনো, সবগুলোতেই দেখা যায়- কাফেররাই আগে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং আগে এসে যুদ্ধের সূচনা করেছে । তাদের কারণেই মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বাধ্য হয়েছেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও সেই পথ অনুসরণ করেছেন। কখনই মুসলমানগণ কাফেরদের সাথে অনর্থক যুদ্ধে জড়াননি এবং যেসব কাফেররা মুসলমানদের বিজয়কে মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হননি। বরং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধেই শুধু জিহাদ করা হয়েছে। আর বাকীদেরকে তাদের আপন অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

---

[৩২৩] তাফসীরে কুরতুবী:৪/৪৩৪

এগুলো কাফেরদের সাথে জিহাদ বৈধ হওয়ার এমন যৌক্তিক কারণ, যা কোনো সচেতন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। আর কোনো বিবেকবান নিরপেক্ষ ব্যক্তি এর উপর প্রশ্নও তুলতে পারে না।

"এই জিহাদের মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিহত করা হয়। নিজের, পরিবারের, দেশের এবং ধর্মের শত্রুদের দূর করা হয়। অনুরূপভাবে যেসব মুসলিমদেরকে কাফেররা তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাদের দ্বীন-ধর্ম এবং বিশ্বাসের হেফাজত হয়। এই জিহাদের মাধ্যমেই দাওয়াতের পথ সহজ হয়। মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পথ খোলা থাকে। সর্বশেষ, যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে, জিহাদের মাধ্যমেই তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দেয়া হয়।"[৩২৪]

সুতরাং এসব জানা-বোঝার পরও পৃথিবীর কোন্ বিবেকবান ব্যক্তি জিহাদের এসব বাস্তবতা, প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতাকে অস্বীকার করবে?!

---

[৩২৪] বিমাযা ইনতাসারুল মুসলিমুন:৫৭-৬২

জিহাদের ময়দানে ইসলামের নৈতিকতা

ইসলামের ভিন্নধর্মী যুদ্ধনীতিঃ

ভালো ব্যবহার, নম্র আচরণ, দুর্বলের প্রতি দয়া, প্রতিবেশি এবং নিকটস্থদেরকে ক্ষমা– এগুলো নিরাপদ এবং শান্তি বজায় থাকা অবস্থায় সবাই করে থাকে, চাই তারা সম্ভ্রান্ত হোক বা বর্বর। কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় ভালো ব্যবহার, শত্রুর সাথে নম্রতা, নারী, শিশু আর বৃদ্ধের প্রতি দয়া এবং পরাজিতদের ক্ষমা করা– এগুলো প্রত্যেকেই করতে পারে না। আর প্রত্যেক যুদ্ধ নেতার দ্বারা এটা সম্ভবও হয় না। বরং রক্ত রক্তের নেশাকে বাড়িয়ে দেয়। শত্রুতা রাগ এবং ক্রোধের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে। বিজয়ের পরমানন্দ বিজয়ীদেরকে পরাজিতদের কাছ থেকে প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ করে তোলে। এটাই পূর্ববর্তী এবং বর্তমান যুগের যুদ্ধের ময়দানের বাস্তব চিত্র; বরং এটা বিশ্ব মানবতার আসল অবস্থা। যা সেই কাবিল হাবিলকে হত্যা করার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– "আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিলো। তখন তাদের একজনেরটা গৃহীত হয়েছিলো আর অপরজনেরটা গৃহীত হয়নি। সে বললো- আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। অপরজন বললো- আল্লাহ তাআলা ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করবেন।"[৩২৫]

ইতিহাস আমাদের সভ্যতার নেতা, সামরিক-বেসামরিক বাহিনী, বিজয়ী এবং শাসকদেরকে চিরস্থায়ী সম্মানের মুকুট পরিধান করিয়েছে। কেননা, তারা ছিলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি। প্রচণ্ড যুদ্ধ আর তীব্র লড়াইয়ের সময় যখন মানুষ হত্যা, প্রতিশোধ আর রক্তপাতের নেশায় পাগল হয়ে ওঠে, এমন পরিস্থিতিতেও তারা প্রতিপক্ষের প্রতি দয়া, ন্যায়বিচার আর মানবতার কথা ভুলে যাননি। আমি তো কসম করে বলতে পারি, যদি ইতিহাসে মুসলিম সভ্যতার চিরসত্য অনন্য, অলৌকিক এবং মনবিক সামরিক নৈতিকতাগুলো লিপিবদ্ধ না থাকতো, তাহলে আমিও বলতাম এগুলো মানুষের অলীক কল্পনা

---

[৩২৫] সুরা মাইদাহ, আয়াত নং-২৭

আর বানোয়াট গপ্পো ছাড়া আর কিছুই না। পৃথিবীতে এসবের কোনো ছায়াও নেই।[৩২৬]

ইসলাম ধর্মে যুদ্ধ না করে শান্তি বজায় রাখাই হলো মূল। ইসলাম সর্বদাই শান্তির কথা বলে। এতদ্বসত্ত্বেও যখন ইসলামে জিহাদকে বৈধ করা হয়েছে, সুতরাং তা এমনিতেই করা হয়নি। অবশ্যই এর পেছনে অনেক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিক উপকারিতা রয়েছে। আর জিহাদের বিধানকে ইসলাম লাগামহীনও ছেড়ে দেয়নি; বরং জিহাদের জন্য অনেক শর্ত-সীমা এবং নিয়ম-কানুনের লাগাম পরিয়েছে ইসলাম। যারা জিহাদ করবে, তাদেরকে অবশ্যই তা মেনে চলতে হবে। জিহাদ যেমনিভাবে অন্যায়-অনাচারী, বিদ্রোহী এবং খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই করতে হয়; কোনো শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ ব্যক্তির সাথে করা যায় না, তদ্রূপ নিজের মন যেভাবে চায় সেভাবেও জিহাদ করা যায় না; বরং ইসলামের দেয়া নীতি-নৈতিকতা রক্ষা করেই তবে জিহাদ করতে হয়।

জিহাদ করার জন্য যেকল নৈতিক শর্তাবলী মেনে চলতে হয়, এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

এক. নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা না করা:-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের জন্য কোনো সেনাবাহিনী পাঠাতেন, তখন তিনি তাদেরকে এই নসীহত করতেন- তারা যাতে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, সর্বদা আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ রাখে এবং জিহাদের ময়দানে গিয়ে নিজেদের নীতি-আদর্শকে ভুলে না যায়। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আদেশ করতেন- তারা যাতে কোনো শিশুকে হত্যা না করে। হযরত বুরাইদা আসলামী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষ দিকনির্দেশনা দিয়ে বলতেন- "সে যেনো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সাথে সাথে এই নির্দেশনাও দিতেন- তোমরা কোনো শিশুকে হত্যা করো না।"[৩২৭]

---

[৩২৬] মিন রওয়াই' হাযারাতিনা:৭৩

[৩২৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩১

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন– "তোমরা বৃদ্ধদেরকে হত্যা করো না। শিশুদেরকে হত্যা করো না। ছোটদেরকে হত্যা করো না এবং নারীদেরকে হত্যা করো না।"[৩২৮]

দুই. ইবাদাতকারীদেরকে হত্যা না করা:-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় নসীহত করে বলতেন– "তোমরা গির্জায় অবস্থানকারীদেরকে হত্যা করো না।"[৩২৯]

তিনি মুতা'র যুদ্ধে গমনকারী সেনাবাহিনীকে নসীহত করে বলেছিলেন– "তোমরা আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও। কাফেরদের সাথে জিহাদ করো। তোমরা জিহাদ করো তবে বাড়াবাড়ি করো না। গাদ্দারি করো না। কাফেরদের অঙ্গ বিকৃত করো না। শিশুদেরকে হত্যা করো না। নারীদেরকে হত্যা করো না। বৃদ্ধদেরকে হত্যা করো না। আর যারা গির্জায় বসে ইবাদাত করে, তাদেরকেও হত্যা করো না।"[৩৩০]

তিন. গাদ্দারি না করা:-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় নসীহত করে বলতেন– "তোমরা গাদ্দারি করো না।"[৩৩১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নসীহতগুলো মুসলমানদেরকে তাদের মুসলিম ভাইদের ক্ষেত্রে করেননি; বরং মুসলমানদের ঐসব শত্রুর ক্ষেত্রে করেছেন, যারা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হচ্ছে আর মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হচ্ছেন! গাদ্দারির বিষয়টা ইসলামে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাদ্দারের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন; যদিও গাদ্দার মুসলমান হয়, আর যার সাথে গাদ্দারি করা হয়েছে সে কাফের হয়! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "যে কোনো কাফেরকে জানের নিরাপত্তা দিয়ে আবার তাকে হত্যা করে দিলো, এরূপ

---

[৩২৮] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং-২৬১৪ সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং১৭৯৩২
[৩২৯] মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদীস নং-২৬৫১
[৩৩০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩১
[৩৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩১

হত্যাকারীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; যদিও নিহত ব্যক্তি কাফের হয়।"[৩৩২]

গাদ্দারি না করা এবং ওয়াদা রক্ষা করা যে কত বড় বিষয়, এটা হযরত সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিলো। একবার হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার নিকট সংবাদ পৌঁছলো- এক মুজাহিদ এক পারস্য সৈনিককে বলেছে, তুমি ভয় পেয়ো না। এরপর তাকে হত্যা করে ফেলেছে। এরপর হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাপতিকে চিঠি লিখলেন– "আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, তোমাদের এক সৈনিক এক কাফেরের পিছু নিয়ে দৌড়াতে লাগলো, একসময় তার পেছন থেকে বললো- ভয় পেয়ো না। এরপর যখন তাকে কাছে পেলো, তখন তাকে হত্যা করে দিলো। ঐ সত্তার কসম! এমন ব্যক্তি যদি আমার নিকট পৌঁছে, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিবো।"[৩৩৩]

চার. জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করা:-

মুসলমানদের জিহাদটা সমসাময়িক যুদ্ধগুলোর মত কোনো ধ্বংসযজ্ঞ নয়- যেখানে অমুসলিম সৈনিকেরা যুদ্ধের ময়দানে মানবজীবন বিনাশে ব্যস্ত থাকে। বরং মুসলিম সেনাবাহিনী জিহাদের ময়দানে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্ট ব্যয় করে, যাতে যুদ্ধগ্রস্ত অঞ্চলের ঘর-বাড়ি ধ্বংস না হয়। যদিও তা শত্রুদের শহর হয়। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহুর কথায় এ বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় তাদেরকে যে নসীহত করেছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন- 'তোমরা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।' শৃঙ্খলা রক্ষায় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা। তার সেই নসীহতে আরও বলেছিলেন– "তোমরা খেজুর গাছ বিনষ্ট করো না এবং তা জ্বালিয়ে দিও না। কোনো প্রাণীকে হত্যা করো না। কোনো ফল গাছ নষ্ট করো না। পরিবেশ খারাপ করো না।"[৩৩৪]

---

[৩৩২] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং- ৫৯৮২ মুসনাদুল বাযযার, হাদীস নং-২৩০৮

[৩৩৩] আল মুআত্তা:৯৬৭ মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার:৫৬৫২

[৩৩৪] সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং-সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং-১৭৯০৪ তারিখে দিমাশক: ২/৭৫

মুসলিমবাহিনী মনে করতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বিশৃঙ্খলা করা যেতে পারে। এজন্য উক্ত নসীহতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, কোনোভাবেই যুদ্ধগ্রস্ত অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। কেননা, সবধরণের বিশৃঙ্খলা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

পাঁচ. বন্দীকে দান করা:-

বন্দীদেরকে দান করা এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা মুসলমানদের জন্য সওয়াবের কাজ। কেননা, বন্দীরা তো এখানে অসহায় এবং পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন। আর তারা সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। পবিত্র কুরআনে বন্দীদের সাহায্য করার বিষয়টাকে এতিম-মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতার সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটাকে ঈমানদারের আলামত ঘোষণা করে বলা হয়েছে– “আর তারা আল্লাহর মুহাব্বতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদেরকে আহার করায়।”[৩৩৫]

ছয়. মৃত ব্যক্তির অঙ্গবিকৃতি না করা:-

ইসলামে মৃত ব্যক্তির অঙ্গবিকৃতি করা একদম নিষিদ্ধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুটপাট এবং অঙ্গবিকৃতি করা নিষিদ্ধ করেছেন।”[৩৩৬]

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন– “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-সদকা করতে উৎসাহ দিয়েছেন আর অঙ্গবিকৃতি করতে নিষেধ করেছেন।”[৩৩৭]

উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় চাচা হামযাকে হত্যা করে তার অঙ্গবিকৃতি করেছিলো। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন কষ্ট পেয়েছিলেন। তবুও তিনি কখনও এর প্রতিশোধ নেননি এবং অঙ্গবিকৃতি বৈধ করেননি। বরং যেসকল মুসলমানরা শত্রুদেরকে হত্যা করে তাদের অঙ্গবিকৃতি করতে চেয়েছিলো, তাদেরকে কঠিন ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বলেন– “কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির অত্যন্ত ভয়াবহ

---

[৩৩৫] সুরা ইনসান, আয়াত নং-৮

[৩৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- -২৩৪২ সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং-সুনানে বাইহাকী, হাদীস নং-১৪৪৫২

[৩৩৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- -২৬৬৭ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২০০১০

শাস্তি হবে, যাকে কোনো নবী হত্যা করেছে অথবা যে কোনো নবীকে হত্যা করেছে, যে নেতা পথভ্রষ্ট এবং যারা মানুষের অঙ্গবিকৃতি করে।"[৩৩৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোটা জীবনেতিহাসে এমন একটা ঘটনাও কেউ দেখাতে পারবে না, যেখানে তিনি মুসলমানদেরকে বলেছেন- তোমরা শত্রুবাহিনীকে হত্যা করে তাদের অঙ্গবিকৃতি করো।

এই হলো যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের নৈতিকতা... যা শত্রুবাহিনীর সম্মানকে বিনষ্ট করে না। কোনো অবস্থাতেই ইনসাফকে ভুলে যায় না। যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী অবস্থায়ও ভুলে যায় না মানবতার কথা..... ।

সমাপ্ত

[৩৩৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৮৬৮

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ কামাল।
ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থানার রুহিতপুরে ২ জুন ১৯৯৫ ইং তারিখে তার জন্ম। বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনার প্রতি তার আগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। শিক্ষার হাতেখরি হয় মুন্সীগঞ্জের বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ সৈয়দপুর জামিআ এমদাদিয়ায়। ২০০৯ সালে হিফয সমাপণ করে শরহেবেকায়া জামাত পর্যন্ত এখানেই অত্যান্ত একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার সাথে অধ্যায়ন করেন। যোগ্যতা ও মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য ২০১৫ সালে এসে ভর্তি হন বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামিআ আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদে। সেখান থেকে যথেষ্ট সুনামের সাথে ২০১৮ সালে দাওরায়ে হাদীস (মাষ্টার্স ডিগ্রি) সমাপন করেন এবং ২০২০ সালে ইফতা সম্পন্ন করেন।
কিতাবের জগতে এটি তার প্রথম প্রকাশনা হলেও ছোটবেলা থেকেই তার লেখালেখির জগতে বেশ প্রসংশা ছিল। ছোট-বড় পত্রিকা ও ধারাবাহিক সাহিত্য সাময়িকীতে তার লেখা ছিল বেশ আকর্ষণীয়।
ব্যক্তিগতভাবে তিনি বেশ অমায়িক স্বভাবের স্বল্প ও মিষ্টভাষী একজন সাধারণ মনের মানুষ। রাগ, গোস্বা, ঝগড়া কিংবা কলুষতা তার সাথে বেমানান। তার ব্যপারে আশাকরি এরচে' বেশি আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।
আল্লাহপাক তার ইলম ও আমল কবুল করুন এবং লেখালেখির জগতে বিচরণকারী প্রত্যেক অগ্রজ লেখক ও পাঠকগণ তার শুভানুদ্ধায়ী হোক এই প্রত্যাশা করি মহান রব্বে কারীমের দরবারে।

মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ খান

ইসলামী শরিয়ত ও দর্শন কখনও নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ভাষা-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম কখনও পিছিয়ে থাকেনি। পিছু হটেনি পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয় থেকেও। বরং ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমেই এই সমস্ত অধিকারগুলো রক্ষা করা হয়েছে এবং এর বাস্তবতা নিশ্চিত করা হয়েছে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করবে, তাদের জন্য রাখা হয়েছে শাস্তির বিধান।